ইন্দুভূষণ দাস

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

প্রকাশ :

ডি, কে, ভাওয়াল

এসিয়া পাবলিশিং কোম্পানী

৯৩ হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা—৭

মুদ্রণ :

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু

প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১ মোহন বাগান লেন,

কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ :

মণি মিত্র

গ্রন্থন :

আলম এ্যাণ্ড কোং

কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ-১৩৬৩

দাম তিন টাকা।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধুদের করকমলে

সমসাময়িক ঘটনাবলীর পটভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার ফলে এ বইয়ের কোন কোন চরিত্র চেনা মনে হ'লেও আসলে ওরা সবাই কল্পলোকের বাসিন্দা।

—লেখক

কলঙ্কলেখা

স্বীকৃতি :

এই উপন্যাসের কিছু অংশ জয়দূত পত্রিকার পূজা সংখ্যায় "মহা জিজ্ঞাসা" নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ এক ॥

জীবনী লিখবার মতো এ হেন চরম দুর্বুদ্ধি যে আমার কেন হ'ল সেই কথাটা এখানে একটু বলা দরকার হয়ে পড়েছে।

ইচ্ছাটা হঠাৎ দানা বাঁধে যমুনার অসুখের সময়। এক রকম হঠাৎই আমার মনে হয় যমুনার আর আমার সত্যিকারের সম্বন্ধের কথাটা ভাষায় রূপ দিতে। আর সেই ইচ্ছারই প্রতিফলন হচ্ছে এই জীবন-চিত্র।

এখানে আরও একটা কথা আগে থেকেই স্বীকার করে রাখছি যে, এতে যে নাম ঠিকানাগুলো লিখেছি সেগুলো সত্যি নয়। যমুনা নামে যার কথা লিখেছি তার আসল নামও যমুনা নয়। অন্যান্য নাম গুলোকেও সত্যিকারের নাম বলে মনে করলে পাঠক পাঠিকা ভুল করবেন। তবে একথা সত্যি যে, নাম ঠিকানাগুলো গোপন করলেও এই কাহিনীতে বর্ণিত বিষয়গুলো মিথ্যা নয়।

যাই হোক, ভূমিকা বাদ দিয়ে এবার আসল কথায় আসা যাক। আসল কথা মানেই যমুনার কথা। এ কাহিনীর নায়িকাই বলুন আর মুখ্য চরিত্রই বলুন সবই ঐ যমুনা। নায়ক আমি কিনা বলতে পারি না, তবে যমুনার জীবনের সঙ্গে নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলাম আমি যাতে অনেকেই হয়তো বলবেন যে আমিই নায়ক। হয়তো তাই।

এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, যমুনার সঙ্গে প্রথম যখন আমার পরিচয় হয় তখন আমার বয়স পনের। তারপর আবার দেখা এবং আবার ছাড়াছাড়ি হয়। এই দ্বিতীয়-বার ছাড়াছাড়ির পর বেশ কিছুদিন আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্কটা আবার যখন আরম্ভ হয়, আমি তখন এক দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার।

সেদিন সংবাদ শিকারের চেষ্টায় বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে যেতেই হঠাৎ অনেক দিনের পরিচিত এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। তাঁকে দেখেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আমার—এই যে মাসিমা! কেমন আছেন?

দুহাতে ঝোলানো থলে দুটোকে লুকাতে বৃথা চেষ্টা করে মহিলাটি বললেন – এই আছি একরকম, তু – তু –

তুমি কথাটা বলতে বোধ হয় মুখে আটকালো তাঁর। তাই সংশোধন করে বললেন—আপনি?

বললাম—এই কেটে যাচ্ছে কোন রকমে।

মহিলাটির হাবভাব দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন সরে পড়তে পারলে বাঁচেন। বলা বাহুল্য আমার অবস্থাও তাই।

আমি তখন "আচ্ছা তাহলে আসি" বলে একটু হেঁ হেঁ টাইপের হাসি হেসে পথ দেখলাম।

একটুখানি গিয়েই কিসের কৌতূহলে আবার আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখতে ইচ্ছা হ'ল মহিলাটি তখনও আছেন কিনা ওখানে। নাঃ! আর দেখতে পাওয়া গেল না তাঁকে।

এই মহিলাটি, অর্থাৎ যাঁকে দেখবার জন্য আবার আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিলাম, তাঁকে আমি চিনতাম। শুধু চিনতাম বললেই সবটুকু বলা হয় না। তাই গোড়া থেকেই বলছি।

লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, একদা মাসিমা বলে কী খাতিরটাই না করতাম ওঁকে। তবে শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে, সত্যিকারের মাসি বোনপো সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সম্বন্ধ আসলে কিছু না থাকলেও, সম্বন্ধ পাতাবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না আমার।

অনেক দিন আগের কথা বলছি। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। থাকি অবিভক্ত বাংলা দেশের পূর্ব অঞ্চলের কোন এক আধা-শহরে। আধা শহর বলছি এই জন্য যে, সেটা ছিল ছোট্ট একটা মহকুমা শহর। সেটাকে শহর বললে শহরের শহরত্বের মর্যাদা হানি করা হয় অনেকখানি।

একটা রেল-স্টেশন, তুটো হাই স্কুল, একটা প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়, এস, ডি, ও-র আদালত, মুন্সেফী আদালত, সপ্তাহে বার তিনেক অচল-অবস্থা-প্রাপ্ত-হওয়া জলের কল, একটা টাউন হল, ফুটবলের মাঠ আর স্টেশনের কাছে কয়েক সারি ঝাঁপ তোলা দোকান—এই নিয়েই শহর।

ঐ শহরেই থাকি আমি। কথাটা অবশ্য ঠিক বলা হ'ল না, কারণ, থাকে সেখানে অনেকেই, আর সেই অনেকের মধ্যে আমিও একজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার গোয়াল ঘর থেকে সবে তখন ছাড়া পেয়েছি ; অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের জন্য দিন গুনছি

আর স্টেশনের 'টি-স্টল'এ আড্ডা জমাচ্ছি, এই সময় একদিন এক মুখরোচক খবর পেলাম যে, আমাদের যতীন চক্রবর্তী নাকি কোলকাতা থেকে আর একটা বিয়ে করে একেবারে বউ নিয়ে বাড়ি এসেছে।

যতীন আমার চেয়ে বয়সে বড়। মানে, বেশ কিছুটা বড়। তার ছোট ভাই অতীন আমার 'ক্লাশ-ফ্রেণ্ড'। এই অতীনের সম্পর্কেই ওদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল আমার। যতীনের সঙ্গে পরিচয়ও সেই সূত্রেই।

যতীনের প্রথমা—যাকে বৌদি বলে ডাকতাম, সে ছিল নেহাৎই পাড়াগেঁয়ে। ছ'সাত বছর আগে বিয়ে হলেও শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে দেড়-গজি ঘোমটা না দিয়ে বের হ'ত না সে। আমরা যে আমরা—অর্থাৎ তার দেবর-স্থানীয়রা, আমরাও বৌদিকে ঘোমটাবৃতা ছাড়া কোনদিন দেখিনি।

বৌদির 'অপজিট্', অর্থাৎ যতীন চক্রবর্তী কিন্তু ছিল একেবারেই মাই-ডিয়ার প্যাটার্ণ-এর লোক। ছোট বড় সবার সঙ্গেই সে মিশতো সমান ভাবে।

বলতে ভুলে গেছি, ওদের বাড়িটা কিন্তু শহরের সীমার মধ্যে ছিল না। অবশ্য শহর থেকে দূরেও ছিল না তাই বলে।

লেখাপড়া যতীন শতকরা আশীজন থেকে বেশিই শিখেছিল। ইংরেজী স্কুলে 'ক্লাশ ছিক্স' পর্যন্ত পড়ে সে সংস্কৃত পড়তে শুরু করে। সে বলতো যে, সে নাকি 'আদ্য' শেষ করে 'মধ্য'রও মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়েছিল। পৈতৃক যজমান ঠেঙানো ব্যবসা নাকি তার ভালো লাগতো না। সে চাইতো বৈচিত্র, উত্তেজনা আর হৈ-হুল্লোড়, যা নাকি তার পৈতৃক কারবারে একেবারেই দুর্লভ ছিল।

বছর কয়েক আগের কথা। আমি তখন থার্ড ক্লাশে পড়ি। হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম যতীন স্যুটকেশ করে 'তানসেন গুলি' আর কি এক মার্কা 'যোয়ান ট্যাবলেট' নিচ্ছে শিউমূরত ঠাকুরের কার্যালয় থেকে।

এই শিউমূরত ঠাকুরের কার্যালয়ের সঙ্গে স্থানীয় স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্রই ছিল বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ শিউমূরতের আসল কার্যটি ছিল মিষ্টির দোকান চালানো। তার দোকানের নিমকি আর ঢাকাই পরটা ছিল এক কথায় অপূর্ব! শিউমূরত জাতিতে বিহারী ব্রাহ্মণ হলেও তখন ঐ নামটুকু ছাড়া বিহারীত্বের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না তার মধ্যে। সে শুধু পরিষ্কার বাংলাই বলতো না, ষ্টেশনের টিকিট কালেক্টরকে ঠেঙাবার ব্যাপারে বোর্ডিংয়ের ছেলেদের ষড়যন্ত্রেও যোগ দিত সে।

এ হেন শিউমূরত একবার কি একটা কাজে কোলকাতা গিয়েছিল। কোলকাতা থেকে ফিরে এসে সে তার দোকানের খানিকটা যায়গা দরমার বেড়া দিয়ে আলাদা করে চেয়ার টেবিল আর বেঞ্চি পেতে একেবারে পুরোদস্তুর অফিস তৈরি করে ফেললো। একটা কাঠের আলমারিও কোথা থেকে যোগাড় করে নিয়ে এলো সে একদিন।

এর কয়েকদিন পর থেকেই দেখা গেল শিউমূরতের সেই অফিসে দু'একজন করে লোকের আনাগোনা। আমাদের পদেন দা—যে ষ্টেশনের কাছে 'সিজন্যাল বিজনেস' করতো, অর্থাৎ গ্রীষ্ম-কালে সরবৎ, শীতকালে চা আর বর্ষাকালে পানের দোকান করতো—তাকেও দেখা গেল একদিন ব্যাগ হাতে শিউমূরতের সেই অফিসে ঢুকতে।

কৌতুহল হ'ল। খবর নিয়ে জানলাম যে, তানসেন গুলি আর যোয়ান ট্যাবলেটের অফিস খুলেছে শিউমুরত। যাতায়াত শুরু করলাম সেখানে। উঠ্‌তি বয়স তখন। শিহরণ অনুভব করতাম ওদের কথাবার্তায়। গণিকা পল্লীর কথা উঠলে যেন গিলতাম সেই সব কথাগুলোকে। খবর নিয়ে জানলাম যে গুলি আর ট্যাবলেট কোম্পানি নাকি শতকরা পঁচাত্তর টাকা কমিশন দেয় শিউমুরতকে। ও থেকে অফিস আর নিজের খরচের জন্য শতকরা পঁচিশ টাকা কেটে রেখে শতকরা পঞ্চাশ টাকা কমিশন দেয় সে ক্যানভাসারদের।

ক্রমে দলে ভারী হ'তে থাকে সেই ক্যানভাসার বাহিনী। ওরা অভিযান চালায় ট্রেনে। সবাই নাকি মোটা রোজগার করে। আমি ছাত্র হ'লেও তখন এঁচোড়ে পক্ক হয়েছি। সিগারেট খাওয়া আগেই রপ্ত করে নিয়েছিলাম। ক্রমে আড্ডা মারতেও ওস্তাদ হ'য়ে উঠলাম।

কোন কোন দিন তো আড্ডা মারতে মারতে সারাটা রাতই কাটিয়ে দিতাম শিউমুরতের কার্যালয়ে।

যতীনের আমদানিও হ'য়েছিল সেই সময়টাতেই।

আড্ডায় একটা গুণ বা দোষ যাই বলুন আছে। সেটা হচ্ছে আড্ডাদারদের বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া। ছোটদেরই বয়স বাড়ে না বড়দের কমে এই তথ্যটা, যাঁরা আড্ডা নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের জন্য রেখে দিয়ে আমি শুধু আমার কথাটাই বলছি। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম যে, আমাদের মধ্যে 'তুই তোকারি' সম্বোধন তো চলছেই; এমন কি অশ্লীল ইয়ার্কি পর্যন্ত চালু হ'য়ে গেছে।

একদিন সন্ধ্যার পরে যতীন আমাকে বললো—এই! যাবি এক জায়গায়?

বললুম—কোথায় রে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে যে জায়গায় নাম ও করলো, তা শুনেই তো আমার চক্ষুস্থির!

বললাম—না ভাই, এখনই বাড়িতে যেতে হবে, কাজ আছে।

যতীন বললো—ভয় পেলি বুঝি?

—ভয় পেয়েছি না ছাই! চল্ না যাচ্ছি।

কিন্তু মুখে ও কথা বললেও মনে মনে সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম আমি।

কি ভেবে যতীন বললো—নারে, থাক! তোর মতো বয়সে ও সব যায়গায় যাওয়া ভাল নয়।

ভাল যে নয় সে কথাটা আমিও জানতাম, কিন্তু শুধু জিদের বশেই যাবো বলে ফেলেছিলাম আমি।

শিউমূরতের সেই কার্যালয়ে বছরখানেক ক্যানভাসারি করে হঠাৎ যতীন কোথায় ডুব মারলো। অনেকদিন তাঁর কোন খোঁজ খবর জানতাম না। পরে শুনেছিলাম সে নাকি কলকাতা গিয়ে কোন এক বিধবা বিবাহ সমিতির প্রচারকের কাজ পেয়েছে।

এরপর আমার স্কুল দশা শেষ হয়েছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। পাশ করবো বলে আশাও করছি। এই সময় যতীনের প্রত্যাবর্তন! শুধু প্রত্যাবর্তনই নয়, সঙ্গে আবার একটা বউ! এ হেন খবর শুনে কি আর ধৈর্য রাখা যায়? সেই দিনই আমি আমার দ্বিচক্রযানে চড়ে ছুটলাম যতীনের বাড়ির উদ্দেশে।

আমি যখন যতীনের বাড়ির সামনে এসে সাইকেল থেকে নেমেছি, ঠিক সেই সময়টিতেই বাড়ির ভিতর থেকে কাংস বিনিন্দিত নারীকণ্ঠ কানে এসে আঘাত করলো—"এ ভুতুড়ে রাজ্যে কেন তুমি নিয়ে এলে আমাদের ?"

যতীনের আওয়াজ শুনতে পেলাম—"আহ্-হা তাতে হয়েছে কি ? আমি বলছি এখানে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না !"

আবার সেই নারীকণ্ঠ—"তোমার আর এক বউ আছে একথা আগে বলোনি কেন ? মেয়েটাকে একেবারে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলুম গা ? হে ভগবান ! তুমিই এর বিচার করো !"

বুঝতে দেরী হ'ল না যে, নব পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে তার মাতৃ-দেবীটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে যতীন।

সাইকেলের ঘণ্টাটা বার কয়েক বাজিয়ে হাঁক দিলাম—যতীন বাড়িতে আছিস ?

খালিগায়ে কাপড়ের আঁচল জড়াতে জড়াতে যতীন বেরিয়ে এসে বললো—আরে ! তুই ? কেমন আছিস বল ?

আমি বললাম—আগে তোর খবরটাই শুনি ?

যতীন বললো—দাঁড়া, জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি। চল্, বাজারের উপরে গিয়েই কথা হবে সব।

আমি বললাম—সে কিরে ? নতুন বউ বিয়ে করে আনলি কোলকাতা থেকে ; চেনা করে দিবিনে ?

যতীন বললো—আজ নয় ভাই, অন্যদিন দেবো। বাড়িতে এসেই শাশুড়ী একেবারে খেপচুরিয়াস্ !

—সে কিরে ! কেন ?

"দাঁড়া আসছি" বলে যতীন বাড়ির ভিতরে চলে গেল আমার

প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই। মিনিট দুয়ের মধ্যেই গায়ে একটা জামা চড়িয়ে ফিরে এসে বললো—চল।

বাজারের বড় পুকুরের ধারে বসে ও যা বললো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হ'ল এই যে, কলকাতায় হরেন পণ্ডিতের বিধবা বিবাহ সমিতিতে কাজ করবার সময় যমুনার সঙ্গে পরিচয় হয় ওর। বেশ মেয়েটি। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচয়টা ভাবে পরিণত হয়। ওদের বাড়িতে যাওয়া আসা চলতে থাকে ঘন ঘন। দেশের বাড়ি সম্বন্ধে অনেক কিছু সত্যি মিথ্যে বানিয়ে বলেছিল ও যমুনা আর তার মায়ের কাছে। মেয়েটি বালবিধবা। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়েছে শুনে ওর নাকি খুবই মায়া হয় যমুনার ওপরে। ও তখন সালঙ্কারে যমুনার মাকে বোঝাতে থাকে যে, পণ্ডিতের বিধবা বিবাহ সমিতি কেবল নামেই সমিতি, আসলে ওখান থেকে বিয়ের নামে বাঙালীর মেয়ে বিক্রি করা হয় বে-জাতের লোকদের কাছে। কথাটা শুনে যমুনার মা, অর্থাৎ যতীনের দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ী যতীনকে ধরে পড়েন যমুনার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। যতীন বলে যে, সে চেষ্টা করবে, তবে নিতান্তই যদি ভাল ছেলে না পাওয়া যায় তাহলে অবশেষে সে নিজেই না হয়—"

যমুনার মায়ের নাকি তর সয় না। তাঁর তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়েই নাকি যমুনাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে সে।

যতীনের প্রেম ও বিবাহের এই রোমাঞ্চকর বিবরণ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। রোমাঞ্চিতও হচ্ছিলাম মাঝে মাঝে। কিন্তু হঠাৎ চমক ভাঙলো যতীনের একটা বেসুরো কথায়—"বড় ঝকমারি করে ফেলেছি ভাই!"

দুই চোখে বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্ন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই ও বললো—বাড়িতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাম রাবণের যুদ্ধ লেগে গেছে। বাবা বলছেন, ওদের তিনি বাড়িতে থাকতে দেবেন না, বড় বউ কথা বন্ধ করেছে, ছোট বউ ঘরে খিল বন্ধ করেছে, আর শাশুড়ী সমানে চেঁচাচ্ছে আর শাপান্ত করছে। আমি যেন ভাই চুরির দায়ে ধরা পড়েছি!

সব শুনে কি বলবো বুঝে উঠতে না পেরে বললাম—তাই তো!

আরও কিছুদিন পর। সেদিন যতীনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্লাটফর্মে। দেখলাম, ও আবার সেই তানসেন গুলি আর জোয়ান ট্যাবলেটের ব্যাগ হাতে নিয়েছে। আমাকে দেখেই ও বলে উঠলো—এই যে সতু! তোকেই খুঁজছিলাম। পিওনপাড়ায় পুকুরের ধারে বাসা নিয়েছি, যাস সন্ধ্যার পরে, বুঝলি?

এই কথা বলেই চলন্ত ট্রেণের ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠে পড়লো ও।

পিওনপাড়ার সবাই আমার পরিচিত তাই যতীনের বাসা খুঁজে বের করতে দেরী হ'ল না আমার।

"যতীন বাড়িতে আছিস?" বলে ডাকতেই লণ্ঠন হাতে যতীন বেরিয়ে এসে বললো—কে, সতু? আয়!

ভিতরে গেলাম।

লণ্ঠনের আলোয় লক্ষ্য করলাম যতীনের দ্বিতীয়াকে। রঙটা একটু ময়লা হলেও দেখতে বেশ! আগের বৌদির মতো ঘোমটা দেওয়া জবুস্থবু নয়।

যতীন বললো—চা খাওয়াবে না তোমার ঠাকুরপোকে?

সলজ্জ হাসি হেসে বৌদি বললো—নিশ্চয়ই।

বৌদি আর তার মা উভয়ের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। কথা-বার্তায়, হাসিখুশিতে, আদর-আপ্যায়নে চমৎকার লাগলো ওদের।

চা খাওয়া হয়ে গেলে যতীন বললো—কি রে? কেমন দেখলি তোর নতুন বৌদিকে?

আমি অকপটেই উত্তর দিলাম—বেশ!

এরপর প্রায়ই আমি যেতে লাগলাম যতীনের বাসায়। সময় নেই, অসময় নেই; ওখানে যাওয়া যেন আমার একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল।

অনেকে এ নিয়ে অনেক কিছু বলতেও আরম্ভ করেছে শুনলাম।

একদিন যতীন নিজেই আমাকে বললো—ছ্যাখ সতু, তুই যে সব সময় আমার বাসায় আসিস, এতে অনেকে অনেক কথা বলছে। তুই বরং আমি বাড়িতে থাকা সময় আসিস্, কেমন?

আমি বললাম—শেষটায় তুইও আমাকে এই কথা বললি? বৌদিকে আমি নিজের বৌদির মতো মনে করেই আসি, তা জানিস?

আমার কথা শুনে যতীন বললো—না ভাই, তুই যখন ইচ্ছা আসবি, তাতে যে যা বলে বলুক! লোকের কথা আমি থোড়াই কেয়ার করি!

যমুনা বৌদির মায়ের সঙ্গে আমি মাসিমা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললাম। এ নিয়ে বৌদি আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতো—বন্ধুকে তাহলে দাদা বলবে না জামাইবাবু বলবে ঠাকুরপো?

আমি হেসে বলতাম—যখন যেটা সুবিধে তখন তাই বলবো।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বের হ'ল।

সারা বছর আড্ডা মেরে কাটালেও দেখতে পেলাম যে, সেকেণ্ড ডিভিসনে উত্‌রে গেছি আমি। বাবা বিদেশে থাকতেন। আমার পাশের খবর পেয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখলেন তিনি। চিঠিতে তিনি আরও লিখলেন যে, শীগ্‌গিরই তিনি এসে আমাকে সঙ্গে করে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি করে দেবেন। ওখানে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতাম। মামা অবশ্য আমার পরকাল অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে—যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করতেন মনে মনে। কিন্তু আমি পাশ করেছি শুনে তিনিও আশীর্বাদ জানালেন আমাকে।

আমার কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করেছি শুনে খারাপই হয়ে গিয়েছিল মনটা। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছিল যে, পাশটা না করলেই ছিল ভাল। কোলকাতায় পড়তে যেতে হবে, যমুনা বৌদিকে আর দেখতে পাব না, শিউমূরতের দোকানে আর আড্ডা দেওয়া চলবে না, সাইকেল নিয়ে টো টো করে ঘুরতে পারবো না; একি কম দুঃখের কথা নাকি?

পাশের খবর দিতে বেশ একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়েই গিয়েছিলাম আমি বৌদির কাছে।

আমার ভারি মুখ দেখে বৌদি জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে ঠাকুরপো?

আমি বললাম—পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

—তাই নাকি! পাশ করেছো তো?

—হ্যাঁ।

আমি পাশ করেছি জেনে বৌদির সে কী আনন্দ! তাড়াতাড়ি চা আর খাবার তৈরি করে খাইয়ে দিল আমাকে।

আমি কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না যে, পাশ করেছি জেনে মনটা খারাপ লাগছে আমার। বৌদিকে ছেড়ে যেতে হবে এ কথাটা মনে হতেই কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল আমার।

ভারাক্রান্ত মন নিয়েই সেদিনকার মতো বিদায় নিলাম আমি।

এর পরদিনই পিওনপাড়ায় এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যার আকস্মিকতায় শুধু আমাকে কেন, শহরের অনেককেই হকচকিয়ে দিল। আমার মন থেকে তখন অন্য সব কিছু ভাবনা চিন্তা চলে গিয়ে সেই ঘটনার কথাটাই শুধু জুড়ে বসলো।

ঘটনাটা হ'ল এই যে, ওখানকার এক উকিলবাবু একটি মেথরানী ছুঁড়ীকে হত্যা করেছিলেন। ব্যাপারটা নাকি শুধু হত্যাই নয়। হত্যার পিছনে নাকি আরও অনেক কিছু ছিল।

যে মেথরানী ছুঁড়ীটাকে হত্যা করা হয়েছিল তাকে আমি চিনতাম। তার মায়ের অসুখ বিসুখ করলে সে আসতো কাজ করতে। ছুঁড়ীটা দেখতে মন্দ ছিল না।

শহরে তখন সবার মুখেই ঐ কথা। চায়ের দোকানে, পথে, ঘাটে, খেলার মাঠে সর্বত্রই ঐ মেথরাণী হত্যা প্রসঙ্গ।

কে একজন বললো—উকিলবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে জানিস ?

—তাই নাকি !

—তাই নাকি মানে ? তাঁকে তো জেলখানায় রাখা হয়েছে। জানিস না ?

সত্যিই জানতাম না সে খবর।

আইন আদালত, পুলিশ, জেল এসব কিছুই তখন জানতাম না ভাল করে। একটি কথা শুধু জানতাম যে, 'খুন করলে ফাঁসী হয়'।

উকিলবাবুর তাহলে ফাঁসী হবে ?

কি রকম করে ফাঁসী দেয় কে জানে ? আমাদের পাড়ায় ঘেঁপু মণ্ডলের বউটা যেভাবে আম গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, সেই রকম করে কি ?

বৌটার কথা আজও আমার মনে আছে। আমাদের বাড়িতে (মামার বাড়ি) প্রায়ই সে আসতো। অনেক দিন তাকে চোখের জল ফেলতেও দেখেছি দিদির কাছে বসে। কি ব্যাপার, কেন সে চোখের জল ফেলতো সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স তখন আমার নয়, তাই বেচারা ঘেঁপু মণ্ডলের বউয়ের চোখে জল দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, বিশেষ কোন দুঃখই আমার হ'ত না।

কিন্তু যেদিন শুনলাম যে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে, সেদিন কেন যেন বুকের ভিতরটা গুমরে উঠেছিল। রাগ হয়েছিল ঘেঁপু মণ্ডলের ওপরে।

যাই হোক, ঘেঁপু মণ্ডলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এবার আসল কথায় আসা যাক।

উকিল বাবুর ব্যাপারটা নিয়ে যখন শহর সরগরম ঠিক সেই সময়ই বাবার আগমন। কাঁচপোকায় যে ভাবে আরশুলা ধরে নিয়ে যায়, বাবাও ঠিক সেইভাবে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

মনের দুঃখে সুটকেস গুছিয়ে, বিছানাপত্তর বাণ্ডিল বেঁধে, ওখানকার ধার দেনা মিটিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে বাবার সঙ্গে ট্রেণে উঠে বসলাম।

কোথায় রইল উকিলবাবুর মামলা, কোথায় রইল তানসেন গুলির কার্যালয়, শিউমুরত, যতীন, যমুনা বৌদি, মাসিমা—সবকিছু ছেড়ে যেতে হ'ল আমাকে।

এত দিনের চেনা স্টেশনটা, স্টেশনের চায়ের দোকান, ক্লাশের বন্ধুবান্ধবরা, বাণী প্রেসের কম্পোজিটার ননী, বন্ধু আকবর হোসেন, ব্রজেন, রাধিকা, নিরাপদ, দুর্গা, সত্যবাবুর কাঁচা মিঠে আমের গাছ, সুধীরের দোকান, ফুটবলের মাঠ, জলিল মিঞা, ক্ষিতীশ, ময়না,— ওদের সবাইকে ফেলে রেখে চলে যেতে হ'ল আমাকে।

যাবার আগে অবশ্য যমুনা বৌদির সঙ্গে দেখা করে বলেছিলাম যে, কলকাতা গেলেও আমি তাকে ভুলবো না। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেব।

বৌদির কাছে বিদায় নিতে সেদিন আমার চোখে জল এসে পড়েছিল।

বলতে ভুলে গেছি, যাবার আগে আমার সাইকেলখানা শিউ-মূরতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম।

এর পরেই শুরু হ'ল কোলকাতার কলেজ-জীবন।

হোস্টেলে বেশি খরচ বলে মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের এক বোর্ডিং-এ ঘর ঠিক করে দিয়ে গেলেন বাবা।

নতুন জীবনের শুরু হ'ল।

মহানগরীর চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা, থিয়েটার, সিনেমা, জু-গার্ডেন, মিউজিয়াম, রাতের আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ, হাওড়া ব্রীজ—দেখবার জিনিস কত এখানে!

নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে তখন অনেক।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই 'ফেভারিট কেবিন', তারপর কিছুক্ষণ পড়াশুনা; তারপর স্নান। স্নানের পরই খাওয়া আর তার পরেই

কলেজ। কলেজের ছুটি হলেই কোন দিন ইডেন গার্ডেন, কোনদিন লেক, কোনদিন পরেশনাথের মন্দির আবার কোনদিন বা সিনেমা।

রবিবার হ'লে তো কথাই নেই। জু-গার্ডেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন বা থিয়েটার।

এত সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে কি আর কোন্ মহকুমা শহরের কে এক যতীন চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ যমুনা দেবীকে মনে থাকে? আর মনে থাকলেও চিঠি লেখা! ছোঃ!

॥ দুই ॥

কয়েক বছর পরের কথা।

লেখাপড়ায় ইতি করে চাকরীতে ঢুকেছি তখন। কোন এক জীবন-বীমা কোম্পানির অফিসে কেরানির চাকরী।

মাইনে? সে কথা নাই বা শুনলেন। বাংলাদেশের কেরানিদের যা মাইনে সাধারণত হয় তাই-ই হয়েছিল আমার। তবে মাইনে যাই হোক, তখন ছিল যুদ্ধপূর্ব যুগ।

পাইস হোটেলে পাঁচ পয়সায় পেট-চুক্তি খাওয়া হ'ত তখন। তিন আনায় 'পায়েস ফ্রি'র যুগ সেটা। সুতরাং মাইনে যাই হোক, সুখেই ছিলাম একরকম।

চাকরীর কল্যাণে বন্ধুবান্ধব মহলে, এমন কি হোটেলে, চায়ের দোকানে আর মিষ্টির দোকানে পর্যন্ত 'ক্রেডিট্' চলতো।

এমনি সময় একদিন অফিসের ছুটির পর রাস্তায় নামতেই দেখি —যতীন!

হাতে এক বোঝা চটের থলে নিয়ে সে হাঁকছে—থলে নেবেন দাদা? মজবুত থলে!

কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম—কি রে যতীন? এখানে দাঁড়িয়ে থলে বিক্রি করছিস যে বড়? বৌদিরা কোথায়?

ম্লান হেসে যতীন বললো—সতেরর আটের বাই সি হিদারাম সরকার লেনে বাসা নিয়েছি, যাস্।

বললাম—আজই যাব। বাসায় থাকিস সন্ধ্যার পরে।

সতেরর আটের বাই সি বের করতে অসুবিধে হ'ল না। ঘরে ঢুকতেই যমুনা বৌদি বললো—এমনি করেই ভুলে গেলে ঠাকুরপো?

কথাটা শুনে লজ্জিতই হলাম।

ঘরখানার চারদিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখলাম, তার বিবরণ কম কথায় দিতে গেলে বলতে হয়—"দারিদ্র্যের ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি।"

এক পাশে একখানা আধ-ভাঙা তক্তাপোষ; তার ওপর অতি-জীর্ণ একটা বিছানা। তক্তাপোষের পাশে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে কয়েকখানা এনামেলের থালা-বাটি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের ভিতরে আড়াআড়িভাবে টাঙানো একটা দড়ির ওপরে একখানা ধুতি আর একখানা ছেঁড়া শাড়ি শুকোচ্ছে। ঘরের অন্যদিকে আর একগাছা দড়িতে খান দুই ধুতি-শাড়ি আর একটা সার্ট ঝুলছে। সবগুলোই ভীষণ ময়লা আর ছেঁড়া। ঘরের মেঝেয় কতকগুলো চটের থলে এক পাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশেই একটা মাটির কলসি আর একটি তোবড়ানো এ্যালুমিনিয়মের গ্লাস।

যমুনা বৌদির শরীর ভেঙে পড়েছে। চোখের কোলে কালো দাগ। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের একি অবস্থা বৌদি?

বৌদি বললো—জিজ্ঞেস করো ঐ গুণধরকে।

যতীনের দিকে তাকিয়ে বললাম—কি রে? তোরা সেই গুলির কাজ ছাড়লি কেন? বেশ তো হচ্ছিল সেখানে!

মাসিমা বোধ হয় বাইরে কোথাও ছিলেন। হঠাৎ ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—বলো না! বন্ধুর কাছে বলো না তোমার গুণের কথাগুলো!

আমি বললাম—বল্ না ভাই কি হয়েছে ?

যতীন বললো—আমি পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে।

—পালিয়ে এসেছিস ! কেন বল্ তো ?

—সে ভাই বলবার মতো কথা নয় !

—কি এমন করেছিস যা আমাকেও বলতে পারছিস না তুই ?

আমার এই কথায় যতীন বার কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো—আমাদের বাড়ির পাশে ডেবরী বলে মেয়েটাকে চিনতিস তো ?

মনে পড়লো, একটি দশ বার বছর বয়সের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ওদের বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসতো।

বললাম—হ্যাঁ। কি হয়েছে তার ?

—হরিপদ নামে এক ক্যানভাসার আসে তুই চলে আসবার বছর দুই বাদে। ঐ হরিপদর সঙ্গে ডেবরীর খুব ভাব হয়। কিন্তু সে ভিন্ন জাত বলে ডেবরীর বাবা ডেবরীকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয় না। আমি তখন হরিপদর অনুরোধে ডেবরীকে নিয়ে পালিয়ে রানাঘাট চলে আসি। হরিপদ ওখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। ডেবরীকে হরিপদর কাছে পৌঁছে দিয়ে দেশে ফিরে যেতেই শুনি, মেয়ে চুরি করে পালিয়েছি বলে আমার নামে পুলিশে এজাহার দিয়েছে ডেবরীর বাবা। আমি তখন সেই রাত্রেই এদের নিয়ে হাঁটা পথে দু'তিনটে স্টেশন পাড়ি মেরে কলকাতায় পালিয়ে আসি।

—তারপর ?

—তানসেন গুলি আর যোয়ান ট্যাবলেটের কলকাতার অফিসেও

নাকি আমার খোঁজ করতে পুলিশ গিয়েছিল। তাই নিরুপায় হয়ে এখানে নাম বদলে আছি আর চটের থলে বিক্রি করছি।

এই বলে একটু চুপ করে থেকে যতীন আবার বললো—বড়ই বে-কায়দায় পড়ে গেছি ভাই!

আমি বললাম—ছাখ যতীন! তুই এই রাজ্যের ঝামেলা নিয়ে থাকিস বলেই একদিন মারা পড়বি, বুঝলি?

ও বললো—আর ভাই, এখন যে অবস্থায় দিন চলছে তাতে তো মারা যাবারই সামিল। হাতে এমন একটা পয়সা নেই যে, তোকে এক কাপ চা কিনে এনে খেতে দিই।

আমি বললাম—থাক্, আর চা খাইয়ে দরকার নেই। এই নে, এই টাকা পাঁচটা রাখ। খুব বিপদ আপদে পড়লে আমার বোর্ডিংয়ে দেখা করিস।

এই বলে আমার বোর্ডিংয়ের ঠিকানাটা লিখে ওর হাতে দিয়ে এলাম আমি।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

সেদিন সকালে উঠে চা খেতে বের হবো এই সময় দেখি মাসিমা এসে হাজির হয়েছেন আমার ওখানে। শশব্যস্তে বললাম—কি ব্যাপার! আপনি হঠাৎ এখানে?

মাসিমা বললেন—একবারটি বাসায় চলো বাবা, ভয়ানক বিপদ।

বাসায় গিয়ে যা শুনলাম তাতে তো আমার চক্ষুস্থির। শুনলাম যে যতীন ধরা পড়েছে। আগের দিন বিকেলে থলে বিক্রি করতে বের হ'লে কে একজন চেনা লোক নাকি ধরিয়ে দেয় তাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ও এখন কোথায় আছে জানেন?

মাসিমা বললেন—জানি। মুচিপাড়া থানায় রেখেছে ওকে। থানা থেকে খবর নিয়ে সিপাই এসেছিল। বাবু আবার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন! একটা পয়সা হাতে নেই, কোথা থেকে ওকে টাকা দিই বলোতো বাবা?

বৌদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে তখন কাঁদছে।

আমি তখন ওঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—আচ্ছা আমি দেখছি কতদূর কি করা যায়।

কিছুই করা গেল না। থানায় খবর নিয়ে জানলাম যে তিন'শ ছেষট্টি ধারার আসামী, তার ওপরে আবার 'এবস্কণ্ডার'—জামীনের কোন আশাই নেই।

অনেক ধরাধরিতে দয়াপরবশ হয়ে দারোগাবাবু বললেন—কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে দেখতে পারেন একবার। আজই কোর্টে 'প্রডিউস' করা হবে আসামীকে।

ধাওয়া করলাম কোর্ট পর্যন্ত।

এর আগে কখনও কোর্টে যাইনি আমি। বোর্ডিংয়ে এসে বাক্স থেকে কিছু টাকা বের করে নিয়ে চললাম কোর্টে। অফিসে যাওয়া আর হ'ল না সেদিন।

কোর্টের হাতার ভিতরে ঢুকতেই চতুর্দিক থেকে আক্রমণ—

কি কেস মশাই?

উকিল দিয়েছেন?

এফিডেবিট হবে কি?

জামীনদার লাগবে?

পুলিস কেস? কোন্ ধারা জানেন?

রকমারি প্রশ্ন! মুহুরী, দালাল, উকিল সবাই প্রশ্নকারী।

ওঁদের মধ্যে এক উকিলবাবুর চেহারা একটু জঁাদরেল গোছের দেখে তাঁকে ধরেই 'কোর্ট-সিন্ধু' পার হবার চেষ্টা করলাম। বললাম —একটু বসে কথা বলবার সুযোগ হবে কি ?

উকিলবাবু বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসুন।

এই বলেই আমার একখানা হাত খপ্‌ করে ধরে ফেলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তিনি।

পাছে মক্কেল বেহাত হয়ে যায় তাই বোধ হয় ঐ ব্যবস্থা।

যাই হোক, অবশেষে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একখানা বেঞ্চে আমাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে বসে বললেন—হ্যাঁ, বলুন তো কি ব্যাপার ?

আমি তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললাম—এখন কি করা যায় বলুন তো ?

উকিলবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন আমার কথা শুনে।

বললেন—কেসটা তো খুবই জটিল দেখছি! জামীন হবে কিনা বলা যায় না। অবশ্য টাকা খরচ করতে পারলে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

—কি রকম খরচ লাগবে ?

—তা ধরুন, ওকালতনামা এক টাকা, কোর্ট ফি এক টাকা, বাবুদের জন্য টাকা পাঁচেক, জামীনদার শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে —তাও ধরুন পাঁচ'শ টাকার জামীন হলে পঁচিশ টাকা, মুহুরীর এক টাকা আর আমার আট—তাহলে হ'ল গিয়ে···

তাহলে যা হ'ল সেটা আমি আগেই হিসাব করে ফেলেছিলাম। উকিল বাবুর হিসাব মতো একচল্লিশ টাকা হয়। আমি তাই বুদ্ধি

খরচ করে বললাম—দেখুন উকিল বাবু! মোটমাট পঁচিশ টাকা দেব আমি। যদি পারেন তো বলুন।

উকিলবাবু বললেন—মাত্র পঁচিশ টাকা! আর কিছু বেশি পারেন না?

আমি বললাম—না।

উকিলবাবু বললেন—বেশ, তাহলে তাই দিন। তবে আর দেরী করে কাজ নেই। শীগ্গির বের করুন টাকা। এখুনি দরখাস্ত টাইপ করতে হবে।

আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পকেট থেকে তুখানা দশ টাকার নোট ও একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে উকিল বাবুর হাতে দিতেই তিনি অতি ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন কোর্টের দিকে।

কি হ'ল বুঝতে না পেরে আমিও তখন ছুটতে লাগলাম তার পিছনে পিছনে।

ছুটতে ছুটতেই বললাম—কি ব্যাপার উকিল বাবু? দরখাস্ত টাইপ করবেন না?

উকিল বাবু বললেন—ওসব পরে হবে, আগে আসুন, আসামীকে দেখিয়ে দেবেন। এখুনি ডাক আরম্ভ হয়ে যাবে। হাকিম এসে গেছেন!

উকিল বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভিড় ঠেলে দোতলায় উঠে গেলাম। একটা ঘরের দরজায় সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম—"চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

উকিলবাবু হন্তদন্ত হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমিও চলেছিলাম তা'র ঠিক পিছনেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! উকিলবাবু ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক লাল পাগড়ী দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো—ইধার কাঁহা যা রঁহা হৈ?

ভয়ে ভয়ে বললাম—ভিতরমে !

লাল-পাগড়ী বললো—নেহি ! অন্দর যানা মানা হৈ।

কী সর্বনাশ ! যতীনকে তাহলে দেখিয়ে দেবে কে ?

আমি বুড়বাকের মতো সিপাই সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে পাশ থেকে কে একজন বলে উঠলো—আরে মুছাই, একটা সিকি দিয়ে দিন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেছে।

কী আর করি ! বাধ্য হয়ে 'সিকি পদ্ধতি'ই অবলম্বন করলাম।

সত্যিই মহিমা আছে দেখলাম সেই ছোট্ট গোলাকার চক্‌চকে জিনিসটার। সিকিটা হাতে পড়তেই সিপাইজির গম্ভীর বদন হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাও একটু ফাঁক হয়ে গেল।

আমি তখন আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে স্যুট্ করে সেই ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে তখন।

একটা বেদীর উপর বসে আছেন কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর আসনের তিনদিক কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংয়ের বাইরে বসেছেন পেস্কার আর একজন কেরানিবাবু। তাঁদের সামনে গাদা-প্রমান কাগজপত্র। হাকিমের সামনে বাঁদিকে সাক্ষীর কাঠগড়া আর ডান দিকে দেয়ালের ধার দিয়ে একটা লম্বা লোহার খাঁচা। খাঁচার মধ্যে অনেকগুলো মানুষ। আন্দাজে বুঝলাম, ওরা সবাই আসামী। যতীনকেও দেখতে পেলাম সেই খাঁচার মধ্যে।

কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন ঘুরছে উকিলবাবুর সন্ধানে। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ?

হঠাৎ দেখি, তিনি সামনের দিকের একখানা চেয়ার দখল করে বসে আছেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে? বললাম—এই যে স্যর?

সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জনে মৃদুস্বরে বলে উঠলো—চুপ! আস্তে!

ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করতে বাধ্য হ'লাম।

এই সময় উকিলবাবু আমার দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—আপনার আসামী কোন জন?

আমি তখন খুব আস্তে আস্তে বললাম—ঐ যে! খাঁচার মধ্যে প্রথম থেকে চার জনের পরে।

উকিল বাবু তখন ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিলেন যতীনকে। তারপর হঠাৎ বরাভয়-দাতা-দেবতার হাতের মতো হাত উঁচু করে যতীনকে অভয় দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম আসামীর?

আমি বললাম—যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

উকিল বাবু বললেন—ঠিক আছে। আপনি পেছনে গিয়ে বসুন।

উকিল বাবুর নির্দেশ মতো পিছনের একখানা বেঞ্চে বসে পড়লাম।

আদালতে তখন এক চুরি মামলার সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই যতীনের ডাক পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে উকিল বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"আই স্ট্যাণ্ড অন বিহাফ্ অব দি এ্যাকিউজ্ড্ ইয়োর অনার!"

পুলিশের তরফ থেকে যা বলা হ'ল তা অনেকটা এইরকম: "এই আসামী···জেলার ..থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামের হরিহরণ সরকারের অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে সরযূবালা ওরফে ডেবরীকে অপহরণ করে পালিয়ে আসে। ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা জানতে পারিনি,

তবে পুলিশ গেজেটে এই আসামীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য হুলিয়া বের হয়েছে।”

এই সময় হাকিম বললেন—পুলিশ গেজেটের সেই সংখ্যাটী আপনার কাছে আছে কি ?

পুলিশের তরফ থেকে যে অফিসারটি কথা বলছিলেন, তিনি তখন ফাইল থেকে একখানা ‘পুলিশ গেজেট’ বের করে বললেন—এই যে স্যর, আছে।

হাকিম সেই গেজেটখানা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পড়ে দেখে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

এই সময় আমাদের সেই উকিলবাবু বললেন—দেখি গেজেট খানা একবার।

পুলিশ অফিসারটি বিরক্ত হলেন মনে হ’ল এই কথায়। কিন্তু বিরক্ত হ’লেও গেজেটখানা উকিলবাবুকে দেখতে দিলেন তিনি।

উকিলবাবু তখন গেজেটখানার পাতা উল্টে প্রয়োজনীয় খবরটি জেনে নিয়ে আবার সেখানাকে ফিরিয়ে দিলেন সেই পুলিশ অফিসারটির হাতে।

পুলিশ অফিসারটি তখন আবার বলতে শুরু করলেন—“কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে, ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানি না। কিন্তু যেহেতু এই আসামীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য গেজেটে হুলিয়া বের হয়েছে এবং যেহেতু নিঃসন্দেহভাবে সনাক্ত করে একে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে; সেই হেতু আমাদের উচিত, আজই একে উপযুক্ত পুলিশ এসকর্ট দিয়ে···থানার ‘অফিসার-ইন্-চার্জ্জ’এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। আমি তাই প্রার্থনা করছি যে, আসামীকে···থানায় পাঠিয়ে দেবার হুকুম দেওয়া হোক !”

পুলিশ অফিসারের কথা শেষ হতেই আমাদের উকিল বাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'য়ে গেল তাঁর বক্তৃতা : "ইয়োর অনার, মাই ক্লায়েণ্ট যতীন চক্রবর্তী ইজ লিভিং হিয়ার উইথ হিজ ফ্যামিলি। হি হ্যাজ বিন ফলস্‌লি ইমপ্লিকেটেড ইন দিস কেস। হি ডিড্ নট্ নো এ্যাট্ অল ছ্যাট্ হি ইজ ওয়ান্টেড্ বাই দি পুলিশ···"

এই বলে আরম্ভ করে আরও অনেক কিছু বলে গেলেন তিনি। প্রায় দশ মিনিট ইংরেজিতে বকর বকর করে অবশেষে তিনি এই বলে থামলেন—"আণ্ডার দি সারকামস্টান্‌সেস্, আই প্রে ছ্যাট হি মে বি রীলিজড্ অন বেল।"

উকিলবাবুর বচনের তোড় শুনে মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু হাকিমের হুকুম শুনেই মনটা দমে গেল আমার। হাকিম বললেন—"দি এ্যাকিউজড্ স্যুড্ বি সেণ্ট্ টু...পি, এস্ ইমিডিয়েট্‌লি। বেল কাণ্ট বি গ্রাণ্টেড্।"

হুকুম হয়ে যেতেই উকিলবাবু আমার হাত ধরে টানতে টানতে কোর্টের বাইরে নিয়ে এসে বললেন—বাবার ওপরেও বাবা আছে জানেন তো? আপনি টাকা বের করুন। আমি হাইকোর্ট করে এখুনি জামীন করে আনছি আসামীকে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—কত টাকা লাগবে?

—কত আর? পঞ্চাশ ষাট্ টাকা হলেই হবে। হাইকোর্ট করলে এ কেস-এর জামীন 'সিওর'।

কিন্তু জামীন 'সিওর' হলে কি হয়, আমার পকেটের অবস্থা যে 'মোস্ট্ আন্‌সিওর'!

আমি তখন আমতা আমতা করে সরে পড়লাম ওখান থেকে।

॥ তিন ॥

এর পরবর্তী অবস্থা ক্রমশই জটিলতর হ'তে আরম্ভ করলো। যতীনকে তখন কলকাতা থেকে চালান দেওয়া হ'য়েছে। ওর বিচার নাকি হ'বে আমার ছেলেবেলার সেই মহকুমা শহরের আদালতে।

বৌদিদের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হ'তে লাগলো। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করতাম তাদের সাহায্য করতে। কিন্তু আমি যা দিতাম তাতে ওদের চলতো না। আমারও আর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য আমার ছিল সীমাবদ্ধ। বোর্ডিংয়ের খরচ, চা, জলখাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ চালাবার পর যা অবশিষ্ট থাকতো তাতে বৌদি আর তার মায়ের সম্পূর্ণ ভরণ পোষণ করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

ব্যাপার বেগোছ দেখে আমি একদিন মাসিমাকে বললাম—অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখানে থাকা আপনাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। আমার মনে হয়, এ অবস্থায় আপনাদের দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।

আমার কথায় মাসিমা বললেন—দেশে কার কাছে যাব বাবা? সেখানে কি কেউ আছে আমাদের? ওখানকার কথা তো সবই তুমি জানো। এ অবস্থায় ওখানে গেলে জামাই-এর বাবা হয়'তো বাড়িতেই ঢুকতে দেবে না আমাদের।

আমি বললাম—তাহলে কি করতে চান? আমার যা অবস্থা তাতে বোর্ডিংয়ের খরচ কুলিয়ে কি করে এখানকার সব খরচ চালাই বলুন?

মাসিমা বললেন—আমাদের জন্য তোমাকে খুব বেশি ভাবতে হ'বে না। আমি মনে করেছি, কাল থেকে ঠোঙা তৈরি করতে আরম্ভ করবো। দুটো পেট্ তো? তুমি যা পার দিও, বাকি টাকা আমরা ঠোঙা তৈরি করেই রোজগার করতে পারবো।

এই সময় যমুনা বৌদি বললো—তাই ভাল ঠাকুরপো। আমাদের সব খরচ তোমাকে চালাতে হ'বে না। তবে দেখাশুনাটা তোমাকেই করতে হবে। তুমি রোজ একবার করে এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যেও, কেমন?

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

আমি যথাসম্ভব খরচ কমিয়ে মাসে বিশ পঁচিশ টাকা করে ওদের সাহায্য করতে আরম্ভ করলাম। ওদের বাজারটাও আমাকেই করে দিয়ে আসতে হ'ত রোজ; অর্থাৎ, প্রকারান্তরে যমুনা বৌদি আর তার মায়ের যাবতীয় ভার আমার ওপরেই পড়লো।

মাস তিনেক পরের কথা।

রোজকার মতো সেদিনও সন্ধ্যার পরে গিয়েছিলাম ওদের খবর নিতে। দেখলাম মাসিমা বাড়িতে নেই। আমি ঘরে ঢুকতেই বৌদি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো।

আমি বললাম—মাসিমা কোথায়?

বৌদি বললো—কি জানি কোথায় বের হয়েছে, বলতে পারি না।

এই বলে একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো—এ ভাবে আর কতদিন চলবে ঠাকুরপো? আজ বাড়িওয়ালা যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছে আমাদের?

বললাম—তাই নাকি? কি বলেছে বাড়িওয়ালা?

—বলেছে, তিন দিনের মধ্যে ভাড়ার টাকা দিতে না পারলে আমাদের হাঁড়িকুঁড়ি টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে দেবে সে।

—বলো কি!

—আর কি বলি। এই বিপদে তুমি আমাকে বাঁচাও ঠাকুরপো!

—কিন্তু আমি কি করে তোমাদের খরচপত্র চালাই তুমিই বলো না? বোর্ডিংয়ের টাকা দিয়ে যা থাকে তাতে তো আর···

—তুমি বরং কাল থেকে এখানেই থাকো না, তাহলেই তো হয়!

—তা...তাও কি সম্ভব?

—কেন, সম্ভব নয় কেন?

—নয়। মানে···আমি ··

আমার কথা শেষ হবার আগেই যমুনা বৌদি হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসলো যা আমি আজও ভেবে পাইনা কি করে করলে ও।

ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো—তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে ঠাকুরপো? আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেবো। তুমি শুধু এই বিপদ থেকে রক্ষা করো আমাকে।

ও আমার মুখখানা টেনে ওর মুখের একেবারে কাছটিতে নিয়ে গেল।

অবিবাহিত তরুণ যুবক আমি। নারীর সান্নিধ্য, তার দেহের উত্তাপ এমন করে আর কখনো পাইনি এর আগে।

আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের মাতলামী শুরু হয়ে গেল।

ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কি একটা বলতে যাবো এই সময় হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে বাজখাঁই কণ্ঠে মাসিমার চিৎকার শুনতে পেলাম—দরজা খোল্! খোল্ দরজা শীগগীর!

অবিন্যস্ত বেশবাস সামলে নিয়ে বৌদি ধড়মড় করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই মূর্তিমতী বিভীষিকার মতো মাসিমা ঘরে ঢুকেই একেবারে ফেটে পড়লেন—কি হচ্ছিলো এখানে?

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব বন্ধুর কাজ করছিলে? পাজী শয়তান! এখনই তোমাকে পুলিশে দেবো আমি। বদমাইস, লম্পট কোথাকার!

আমি কিছু বলবার চেষ্টা করতেই আবার চিৎকার—চুপ্! ভাল চাও তো এখনই এক'শ টাকা এনে দিয়ে যাও, নইলে তোমার আমি কি হাল করবো তা টের পাবে! পাঁচ পাঁচ জন সাক্ষী আছে তা জানো?

লজ্জায়, ঘৃণায় আর ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম আমি।

আগের দিনই মাইনে পেয়েছিলাম; তাছাড়া বাবাও কিছু টাকা পাঠিয়ে ছিলেন বাড়ির জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে। হিসাব করে দেখলাম, দুয়ে মিলে এক'শ টাকা হয়ে যাবে। তাই বললাম—আমি আর আসব না। আপনি বরং চলুন আমার সঙ্গে, টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

মাসিমা বললেন,—বেশ চলো!

রাস্তায় এসে একখানা রিক্সা ভাড়া করে সোজা ওঁকে আমার বোর্ডিংয়ে নিয়ে এলাম। ওঁকে রিক্সায় অপেক্ষা করতে বলে আমি একরকম ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে বাক্স খুলে নোট-

গুলো বের করে নিয়ে আবার নিচে নেমে গেলাম। রিক্সার কাছে গিয়ে নোটগুলো ওঁর হাতে দিয়ে বললাম—এই নিন।

টাকা হাতে পেয়ে মাসিমা কি যেন বলতে চাইলেন মনে হ'ল, কিন্তু আমি আর দেরী না করে সেখান থেকে সরে পড়লাম।

ওঁকে বিদায় দিয়ে এসে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। আমার তখনও বুক কাঁপছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হতে লাগলো যে আজ আমার মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল। কি সর্বনেশে মেয়েছেলে রে বাবা! বলে কি না পুলিশে দেবে! নিশ্চয়ই ওরা যুক্তি করে আজ আমাকে ঐ ভাবে বে-কায়দায় ফেলেছিল। কিন্তু বৌদিও শেষে ঐ রকম করলো আমার সঙ্গে! দুনিয়ায় কি কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না? ওদের জন্য আমি কি না করেছি। যতীন থাকতেও আমি প্রতি মাসে ওদের দশ পনের টাকা করে সাহায্য করেছি, তারপর যতীনের জন্য থানা-পুলিশ-কোর্ট করতেও গেছে প্রায় ত্রিশ টাকা। তাছাড়া দু' দুটো মাস ওদের সব কিছু খরচ আমিই চালিয়েছি; মাসে পঁচিশ টাকা করে তো দিয়েইছি, তার ওপর বৌদির পরণে কাপড় ছিল না বলে দুখানা শাড়ি কিনে দিয়েছি; নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্যাণ্ডেল কিনে দিয়েছি—কিন্তু এই কি তার প্রতিদান? কেন? কেন ও আমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করলো? রাগে, দুঃখে আর লজ্জায় আমার অবস্থা তখন সাংঘাতিক।

এদিকে রাত দশটা বেজে যায় তবুও আমি খেতে যাচ্ছি না দেখে ম্যানেজার এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলো। দরজা না খুলেই বললাম—কি বলছেন ম্যানেজার বাবু?

ম্যানেজার বললো—খাবেন না?

আমি বললাম—না, আজ শরীরটা ভাল নেই। আজ আর কিছু খাব না।

রাত্রে ঘুম আসতে অনেক দেরী হ'ল। প্রায় দুটো পর্যন্ত জেগে থেকে শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম যে, বৌদিকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ভাবে ঘর করছি আমি। চমৎকার একখানা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে বৌদিকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছি একদিন। পাশাপাশি সিটে বসেছি আমরা। ওর শাড়ি থেকে একটা চমৎকার ঘ্রাণ এসে লাগছে আমার নাকে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে দেখতে ওর একখানা হাত আমি টেনে নিয়েছি নিজের হাতের মধ্যে···

আবার দেখছি—বৌদি রান্না করছে, আমি বাজার করে এনে দিয়েছি। পোনা মাছ খেতে বৌদি খুব ভালবাসে তাই পোনা মাছের পেটি আর বড় বড় নৈনিতাল আলু এনেছি আমি। মাছ কুটতে কুটতে আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে বৌদি। বলছে—আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার বন্ধু যদি এসে দেখতে পায় যে, আমি তোমার সঙ্গে ঘর করছি, তাহলে?···

আবার দেখলাম···বৌদি আমার কাছে শুয়ে আছে। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওর মুখখানা। আমি ধীরে ধীরে ওর মুখের কাছে মুখ নিতেই হঠাৎ ওর নাকের ভিতর থেকে এক বিরাট অজগর সাপ বেরিয়ে এসে ফোঁস ফোঁস করে ফণা দোলাতে লাগলো আমার মুখের সামনে। অজগরটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল সেটা যেন যতীনের

মুখ। হঠাৎ দেখি বাঘে রূপান্তরিত হয়ে গেল অজগরটা। আমাকে ছেড়ে দিয়ে বৌদির দিকে তাকাতে লাগলো বাঘটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে।

বৌদি ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—আমাকে বাঁচাও ঠাকুরপো!

বাঘটা তখন বৌদিকে ছেড়ে দিয়ে আমার উপরে লাফিয়ে পড়লো। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো।

হঠাৎ দেখি বাঘটা কি করে পুলিশ হয়ে গেছে। হাতে হাতকড়া নিয়ে আমার দিকে এগোচ্ছে পুলিশটা।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। আমার শরীর তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে!

সুইচ্‌টা টিপে দিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম ঘরের। বালিশের তলা থেকে হাত-ঘড়িটা বের করে দেখলাম—রাত চারটে তের।

টেবিলের ওপরে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই ছিল। একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে টানতে লাগলাম আমি।

আলো নিবিয়ে শুতে ভয় করতে লাগলো তাই আলো জ্বেলেই শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। ঘড়ি দেখলাম—আটটা তেইশ।

॥ চার ॥

এর পরের কাহিনী নিতান্তই তথ্যগত।

বৌদিদের সঙ্গে সেই থেকেই সম্পর্কচ্ছেদ করেছি আমি। ইতিমধ্যে বছর দুই কেটে গেছে।

জীবন-বীমা অফিসের চাকরি ছেড়ে আমি তখন এক দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার হয়ে ঢুকেছি। সর্টহ্যাণ্ডটা জানা ছিল, তাই রিপোর্টারের কাজটা জুটে গিয়েছিল দরখাস্ত করতেই।

তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, খবরের কাগজ অফিসের চাকুরীর কোন দামই ছিল না সে সময়। মার্চেণ্ট অফিসের কেরানি বাবুর যে দাম, কাগজ অফিসের রিপোর্টারের দাম তার চেয়ে অনেক কম। আজ অবশ্য চাকা ঘুরে গেছে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি, তখন পত্রিকা অফিসের বাবুদের হাল বড় সুবিধের ছিল না।

যাই হোক, আমি তখন পুরোদস্তুর সাংবাদিক।

বিকেল দুটোয় অফিসে যাই আর ফিরি রাত একটায়। অফিসে হাজিরা দিয়েই বের হই সংবাদ শিকারে। শহরের সংবাদ জোগাড় করবার কতকগুলো 'সর্টকাট্' বা 'মেড্ ইজি' পন্থা আছে। দুর্ঘটনার

খবর হাসপাতালগুলোর এমার্জেন্সীতে ফোন করলেই জানা যায়! থানাগুলো থেকে জানা যায় দুদ্ধর্ষ অপরাধীদের গ্রেপ্তারের বিবরণ। গভর্ণমেন্টের খবর পেতে তো কোন হাঙ্গামাই নেই। খবর জানাবার জন্য একটি বিভাগই আছে গভর্ণমেন্টের। মোট কথা, কলম দুই তিনের মতো খবর জোগাড় হলেই হ'য়ে গেল সেদিনের মতো কাজ। তারপর সেই খবরগুলোকে লিখে ফেলে সোজা নিউজ এডিটরের টেবিলে। নিউজ এডিটার খবরগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে পাঠিয়ে দেন বিভিন্ন সাব-এডিটারদের টেবিলে—হেডিং ঠিক করে এডিট করে দিতে। তার পরেই কম্পোজ ঘরে।

আমাদের পত্রিকার অবস্থা তখন আজকের মতো ছিল না। এখন যেমন লাইনোতে কম্পোজ হয়ে বিরাট রোটারী মেসিনে ছাপা হয়, তখন কিন্তু তা হ'ত না। কম্পোজ হ'ত 'স্মল পাইকা' টাইপে আর হেড্‌লাইন হ'তো 'গ্রেট', 'ডবল গ্রেট' আর 'কমপ্রেসড্‌-ডবল-গ্রেট' টাইপে। মুখরোচক বা 'জবর খবর' হলে মাঝে মাঝে কাঠের 'টাইপ'ও ব্যবহার করা হ'ত। আজকাল যেমন প্রথম পৃষ্ঠার প্রাধান্য চলছে সংবাদপত্র জগতে, সে সময় তা ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠায় তখন ছাপা হ'ত বিজ্ঞাপন।

আমাদের অফিসে তখন সব চেয়ে বেশি খাতির পেতেন বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহক এজেন্টরা। বিজ্ঞাপন অফিসের মালিক এলে তো কথাই নেই। যেন গুরুঠাকুর বাড়িতে এসেছেন, সেইভাবে আদর-আপ্যায়ন শুরু হয়ে যেতো। তাঁদের এমনই ক্ষমতা ছিল যে, যা খুশি ছাপিয়ে দিতে পারতেন কাগজে।

এক টাকা কলম-ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের রেট। তার ওপর কমিশন দেওয়া হ'ত শতকরা পঁচিশ টাকা। সময় সময় আবার আরও বেশি কমিশন দেওয়া হ'ত।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট আর ডালহৌসী স্কোয়ারের কারবারীরা মনে করতেন যে, তাঁরা খবরের কাগজকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দয়া করছেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, বাংলা খবরের কাগজ-ওয়ালাদের দিয়ে যা ইচ্ছে লিখিয়ে নেওয়া যায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়। সেই আমলের খবরের কাগজ জোগাড় করে পড়ে দেখলে যে কোন লোকই জানতে পারবেন এটা।

সম্পাদকীয় লিখতেন সম্পাদক মশাই নিজেই। ভদ্রলোকের একটু পানদোষ ছিল। কিন্তু পানদোষকে যে পরিমাণ টাকা পেলে 'পান-গুণ'এ রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ মা কালী ব্র্যাণ্ড ভাইনাম ডি প্যাডির পরিবর্তে স্কচ্ হুইস্কি বা ফরাসী ব্রাণ্ডি অপর্যাপ্ত পান করে কেউকেটা মহলে মেশা যায়, সে রকম টাকা তিনি পেতেন না। ফলে ভদ্রলোকের বরাত 'ডি ওয়ালডি'র পানীয়ের চাইতে ওপরে উঠতো না।

কিন্তু হঠাৎ বরাত খুলে যাওয়ার দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন হিটলার নামে জনৈক জার্মাণ ভদ্রলোক। বলা নেই কওয়া নেই পোল-করিডর দাবী করে বসলেন তিনি কয়েক ঘণ্টার সময় দিয়ে। পোল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ভাল করে বিষয়টা বুঝবার আগেই দেখতে পেলেন যে, হিটলারের নাৎসী বাহিনী তাঁদের দেশের অর্ধেকের বেশি অধিকার করে ফেলেছে।

সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো সেই পিলে-চমকানো খবর। দুই ইঞ্চি কাঠের টাইপে হেড্ লাইন দিয়ে আমাদের পত্রিকায় বের হ'ল যুদ্ধের প্রথম খবর। তারিখটা আজও মনে আছে। ইংরাজী ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর।

এর পরেই কেবল খবর আর খবর।

সকলের মুখেই তখন এক কথা—যুদ্ধ! চায়ের দোকানে 'যুদ্ধ', রাস্তায়, ঘাটে, অফিসে, আদালতে সর্বত্রই 'যুদ্ধ'। আর সেই যুদ্ধের হাতিয়ার হ'ল খবরের কাগজ। পাঁচ হাজার থেকে দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশ হাজারে উঠে গেল আমাদের পত্রিকার 'সারকুলেশন'।

আমাদের বাকি মাইনে 'ক্লিয়ার' হ'ল। মাইনে কিছু বাড়লোও।

এর পর থেকেই কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। রোজই দারুণ দারুণ খবর আসে সেই যুদ্ধের। নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ। পোলাণ্ড আর বেলজিয়মকে দলে পিষে ফ্রান্সের মাটিতে হানা দিল নাৎসী বাহিনী। ম্যাজিনো লাইন ভেঙে গেল। ফরাসী বাহিনী বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হ'ল।

মার্শাল পেঁতা গভর্ণমেণ্ট গঠন করলেন ফ্রান্সে। এদিকে জেনারেল দ্য-গল ঘোষণা করলেন যে, পেঁতা গভর্ণমেণ্টকে তিনি মানেন না। রাণী উইলহেলমিনা সদলে পালিয়ে এসে লণ্ডনে অফিস খুলে তাঁর উদ্বাস্তু গভর্ণমেণ্ট চালাতে থাকলেন।

ওদিকে আমেরিকা নিরাপদ দূরত্বে বসে তৈরি করে চলেছে সমর সম্ভার। দুনিয়ার ক্যাপিটালিস্ট মহল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের মওকায় আখের গুছিয়ে নেবার মতলব। ভারতের বাজারেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে ধীর গতিতে। আমদানি বাণিজ্য হ্রাস হয়েছে। দাম চড়ে যাচ্ছে বিদেশী জিনিসের।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন । কড়া। প্রভিন্সিয়াল অটোনমির ধাক্কায় রাজনৈতিক দলগুে মধ্যে তখন হাত মেলামেলির কাজ চলছে সদরে ও অন্দরে। সারা ভারতের বেশিরভাগ প্রদেশের মন্ত্রীয়ানার গদী তখন কংগ্রেসের দখলে। আর এই দখলি সত্ব থেকে তাদের বে-দখল করবার উদ্দেশ্যে চলেছে গোপনে ও প্রকাশ্যে ঘুঁটি চালাচালি। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন এই।

বাংলায় তখন মুসলীম লীগ গভর্ণমেণ্ট। সে গভর্ণমেণ্টের মাথায় বসে ফজলুল হক্ সাহেব ভেল্কী দেখাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন খাজা নাজিমুদ্দিন, সহিদ সুরাবর্দ্দী এবং আরও অনেকে।

শের-ই বঙালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন টাকা-নীতি-বিষারদ স্বর্গত নলিনী সরকার।

ভীম বেগে চালু হয়ে গেছে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন!

এদিকে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র (তখনও নেতাজী হন নি) মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। উত্তর প্রদেশের জবরদস্ত নেতা গ-ব-প (শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ, হিন্দীতে ইনি সংক্ষেপে গ-ব-প বলে সই করেন) তাঁর ফুটো নৌকোয় ধূয়া তুলেও সুবিধা করতে পারলেন না।

বহু ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হ'লেন।

আসামের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত গোপীনাথ বড়দলৈ আসামের চা বাগানগুলোর উপর কৃষি আয়কর ধার্য করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

ক্ষেপে গিয়ে স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় "ক্রিমিন্যাল গভর্ণমেণ্ট" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের হ'ল।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তখন সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করে চলেছেন কংগ্রেস হাই কমাণ্ড। ফলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ, আই, সি, সি'র সভায় সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। নূতন প্রেসিডেণ্ট হলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্তমানে—যিনি রাষ্ট্রপতি।

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক নতুন দল গঠন করলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর দাবী হ'ল—পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, কোন রকম আপোষ আলোচনা চলবে না।

ওদিকে মুস্‌লীম লীগ প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না (পরবর্তী কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থাপয়িতা ও তার প্রথম গভর্ণর জেনারেল) তখন কংগ্রেসের সঙ্গে তীব্রভাবে অসহযোগিতা করে চলেছেন।

খবরের অন্ত নেই।

কিন্তু যারা ঐ সব খবরগুলোকে কথার মালায় সাজিয়ে প্রতি সকালে ছাপিয়ে বের করছে, অর্থাৎ আমাদের মতো সাংবাদিকরা, তাদের অবস্থা তখন মোটেই সুবিধের নয়। বিকেল থেকে রাত বারটা একটা পর্যন্ত কলম গুঁতিয়ে আর মুখে রাজা উজীর মেরে তারা যখন বাড়িতে ফেরে তখন পকেট একেবারে গড়ের মাঠ। আগামী কালের বাজারের পয়সাও থাকে না।

এমনি ভাবেই দিন যাচ্ছিল আমার।

রোজ রোজ যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে আর লিখতে লিখতে অমন যে যুদ্ধ, তার ওপরেও কেমন যেন বীতস্পৃহা এসে যাচ্ছিল আমার।

হঠাৎ আবার বাজার গরম করে তুললো জাপান। একদিন খবর এসে গেল যে, জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে। পূর্ব দিগন্তে রণভেরী বেজে উঠলো।

আমাদের কাগজের সারকুলেশন তখন পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে ষাট হাজারে উঠে গেছে। কলকাতার বাজারে জিনিসপত্রের দাম চড়তে চড়তে আগুন হয়ে গেল। আমাদের অবস্থারও কিছু পরিবর্তন হ'ল। মাইনে আরও কিছু বাড়লো। আর বাড়লো ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স। কিন্তু তাতেও কুলোয় না। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় মাইনে বৃদ্ধি নিতান্তই অকিঞ্চিতকর!

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে তখন জাপানের জয়জয়কার। বিদ্যুৎগতিতে পূর্ব এশিয়া গ্রাস করে নিচ্ছে তারা। সিঙ্গাপুর আক্রান্ত হ'ল। ব্রিটিশ রণতরী 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ও "রিপাল্স্" ঘায়েল হ'ল। ক'দিন পরেই খবর এলো সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। জাপানীরা সিঙ্গাপুরের নূতন নাম দিয়েছে "সোনান"।

এদিকে সুভাষচন্দ্র তখন ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন। খবর আসতে লাগলো—সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গেছেন। সেখান থেকে ইটালি। তারপর জাপান।

ওদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন তুমূল যুদ্ধ চলেছে রাশিয়ার সঙ্গে। চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করে বসেছে হিটলার।

কলকাতার বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (এ. আর. পি.) আরম্ভ হয়েছে।

সংবাদপত্রের চাহিদা তখন অসাধারণ। পেপার কণ্ট্রোল হয়েছে।

এক টাকা কলম ইঞ্চির বিজ্ঞাপনের হার—চার টাকা—পাঁচ টাকা—হতে হ'তে হ'তে দশ টাকায় উঠেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে শত শত ব্যাঙ্ক। বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন! কাগজ-গুলো মাসে লাখ লাখ টাকা কামাতে শুরু করলো।

আমরা চেঁচামেচি শুরু করলাম—মাইনে বাড়াতে হবে।

মাইনে বাড়তে বাড়তে আড়াই শ' টাকা হ'ল।

এদিকে ফজলুল হক্ গভর্ণমেণ্ট গিয়ে নাজিম গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে।

কলকাতা শহর হয়ে উঠেছে বিরাট মিলিটারী সেণ্টার। আমেরিকা যুদ্ধে নেমে পড়বার পর পূর্ব রণাঙ্গণের ভার প্রধানতঃ তার ওপরেই এসে পড়েছে। এক্সিস আর এলাইজ—অক্ষশক্তি আর মিত্রশক্তির শক্তির বিবরণী লিখে শক্তি ক্ষয় করে চলেছি আমরা।

রাশিয়া মিতালি পাতিয়েছে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার সঙ্গে

এদিকে ভারতের অবস্থা তখন গুরুতর।

কংগ্রেস দেশের শাসনভার পরিত্যাগ করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে দাবী তোলা হয়েছে—'ভারত ছাড়'।

ঐতিহাসিক ৯ই আগষ্ট।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করলো ব্রিটিশ তাঁবেদার ভারত গভর্ণমেণ্ট।

ওদিকে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব বর্জন করতেই জিন্না সাহেব পালন করলেন—"ডে অব ডেলিভারেন্স।"

টাকার খেল চলছে তখন দেশে।

আরম্ভ হ'ল বিয়াল্লিশের আন্দোলন। মেদিনীপুরে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠিত হ'ল। চরম বর্বরতার সংগে দমন করা হ'তে লাগল জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা "জনযুদ্ধ" জিগির তুললো—জাপানীকে রুখতে হবে।

সরকারের টাকায় লেখক আর সাংবাদিকদের নিয়ে জোট পাকিয়ে ছড়া বাঁধা হ'ল ঃ

"বজ্র কণ্ঠে তোল আওয়াজ,
রুখবো দস্যু দলকে আজ।
দেবেনা জাপানী উড়ো জাহাজ
ভারতে ছুড়ে স্বরাজ।"

দেশের লোক বললো—ওরা প্রতিক্রিয়াশীল—দেশদ্রোহী।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সংবাদ পেলাম। কাগজে কিন্তু ছাপা হ'ত না সে খবর। লক্ষ লক্ষ টাকার ওয়ার ফ্রন্টের বিজ্ঞাপন। দেশের লোকদের বুঝাতে থাকি আমরা—জাপানীরা দস্যু, জাপান এলে মহা সর্বনাশ হবে দেশের!

॥ পাঁচ ॥

এদিকে ফাঁক তালে আমি তখন লেখক বনে গেছি। যুদ্ধের মওকায় লিখতে পারলেই লেখক। যে যা করে তাতেই পোয়া বারো। প্রকাশক মহলে রব উঠেছে—বই চাই, পাণ্ডুলিপি চাই।

হেঁইও হেঁইও রবে লেখা শুরু করেছে হালি লেখকের দল। ছাপাও হচ্ছে সে সব লেখা। দামও মিলছে বেশ। তিন'শ, চার'শ, পাচ'শ।

বকেয়াদের তো কথাই নেই। তাঁদের মাল বিকোচ্ছে হাজার দু'হাজার দরে। কেউ কেউ নাকি পাঁচ হাজারী মনসবদারও বনে' গেছেন খবর পেলাম। লেখকরাও যে রোজগার করে এ রকম কথা এর আগে জানা ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের কল্যাণে সেই অজানা কথাই জানা হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ আবার মোটা টাকা দাদনও নিতে আরম্ভ করলেন।

যাঁদের কিছু নাম আছে অথচ কলম দিয়ে আর মাল বের হচ্ছে না, তাঁরা শুরু করলেন ভাড়াটে লেখকদের দিয়ে লেখানো। একে তাকে দিয়ে লিখিয়ে সেগুলোকে নিজের নামে ছাড়তে লাগলেন মোটা টাকার বিনিময়ে।

কলেজ ষ্ট্রীটের প্রকাশকদের মধ্যে যাঁরা ঘর ভাড়া দিতে না পেরে কারবার গুটিয়ে ফেলবার কথা চিন্তা করছিলেন কিছুদিন আগেও,

তাঁদেরও দেখা গেল আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যেতে। বিগত দিনের বস্তাপচা বইগুলোরও সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপা হ'তে লাগলো।

ছু'একজন অতি বুদ্ধিমান লোক আবার ইংরেজী বই ছাপতে শুরু করলেন। ইংরেজী বইয়ের চাহিদার তখন মা বাপ নেই। মোটা টাকায় এডিসন কিনেও যথেষ্ট লাভ করতে লাগলেন তাঁরা ইংরেজী বই ছেপে। অবশ্য ও সব বইয়ের মধ্যে বালজাক্ প্রভৃতি লেখকদের বইই ছাপা হ'তে লাগলো বেশি। নারীদেহের রসে সিক্ত বইয়ের চাহিদা সৈন্যদের কাছে অত্যন্ত বেশি।

সেই ডামাডোলের বাজারে রাম, শ্যাম, যত্থ, মধু্ সবাই লেখক বনে' যেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, যত্থ-মধুদের মধ্যে অনেকে আবার কলম ছেড়ে কণ্ট্রাকটারীতে লেগে গেছে। কেতাবী কারবারের চাইতে এরোড্রোমের শ্ল্যাব ঢালাই করলেই বেশি আমদানি হয় দেখে কলমবাজী ছেড়ে ঠিকেদারী ধরলেন তাঁরা। ফলে লেখকের বাজারে ধরলো রীতিমত টান। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে, বই হলেই হ'ল।

তের বছরে যে বইয়ের একটি সংস্করণ কাটেনি, তের মাসে সেই বইয়ের তিনটি সংস্করণ ছাপা হ'য়ে যেতে লাগলো।

বলা বাহুল্য, বইয়ের সেই বিরাট চাহিদার বাজারে আমার লেখা বইও বেরিয়ে গেল কয়েকখানা।

আজ অবশ্য আমার লেখা সেই সব বই পড়লে নিজেরই হাসি পায়। ঘটনার মাথামুণ্ড নেই, ভাষার জোর নেই, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা এসে পড়েছে। সাধু্ ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে চলিত ভাষা—কিন্তু তবুও সে সব বই ছাপা হ'ল। আর সব চেয়ে বড় কথা, টাকাও পেলাম সেই সব বই লিখে। বুঝুন ব্যাপারখানা!

বন্ধু-বান্ধবদের ধরাধরি করে সমালোচনাও ভালই বের করা গেল আমার লেখা বইগুলোর।

সুতরাং অচিরেই আমি সাহিত্যিক বনে' গেলাম। প্রকাশকের অভাব নাই। যা লিখে নিয়ে যাই তাই ছাপা হয়। তাই বিক্রি হয় তখন।

এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিনের কথা। এক ডিটেকটিভ-ওয়ালা তো রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে তখন। মাসে দশখানা করে বই বের হচ্ছে তার। মাসে দশখানা অর্থাৎ গড়ে তিন দিনে একখানা। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা একবার!

প্রেস মালিকেরা সমিতি করে দর বাড়াতে লাগলেন ছাপার। যুদ্ধের আগে ছ' টাকায় ফর্মা ছাপা হ'ত, তাও ধারে, কিন্তু যুদ্ধের সময় এক ফর্মা (ষোল পৃষ্ঠা) ছাপার দর হ'ল কম পক্ষে বত্রিশ টাকা। ধারের কথা তো ভুলেই গেলেন তাঁরা।

কাপড়ের বাঁধাই লুপ্ত হয়ে কাগজের বাঁধাই আরম্ভ হয়েছে তখন। ফলে প্রচ্ছদপটের বাহার বেড়ে গেছে। আমেরিকার অনুকরণে আর্ট পেপারে রঙিন ছবি ছাপা শুরু হয়েছে মলাটে।

ভিতরের দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করা হচ্ছে বাইরের চাকচিক্য দিয়ে। এ ব্যাপারে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমানে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে কেতাব রাজ্য। ভিতরে ছুঁচোর কীর্তনকে বাইরের কোঁচার পত্তনের আড়ম্বরে ঢেকে রাখা হচ্ছে আর কি!

আমার তখন কাজ আর কাজ। লেখা আর লেখা। দিনের শেষ থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কাগজী লেখা; আর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বই লেখা।

প্লটের জন্য ভাবতে হয় না। সেজন্য আছে ইংরেজী বই। স্রেফ্ নাম ধাম বদলে 'ট্যাক্‌ট্‌ফুলি' টুক্‌নিফাই করতে পারলেই কাজ ফতে!

সাহিত্যের বাজারে তখনও এত অনুবাদের ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়নি। আমি তাই মনের আনন্দে টোকাই-কারবার চালিয়ে যাচ্ছি আর প্রকাশক বধ করছি।

এদিকে তখন আন্তর্জাতিক কেউকেটার দল সমানে গলাবাজী করে চলেছেন। স্তালিন, ট্রুম্যান, চার্চিল, আইসেনহাওয়ার, ম্যাক্-আর্থার, হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রমুখ রাজনৈতিক ও রণনৈতিক ধুরন্ধররা বক্তৃতা, বিবৃতি আর বচনের গুঁতোয় দুনিয়া তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছেন।

॥ ছয় ॥

কলকাতায় তখন এক নতুন ব্যবসায়ের পত্তন হয়েছে—'মাসেজ ক্লিনিক' বা অঙ্গ সংবাহনাগার। বিদেশী সৈনিক আর পয়সাওয়ালা দেশী লোকদের অঙ্গ সংবাহনের জন্য বৈজ্ঞানিক (?) প্রথায় 'মাসেজ ক্লিনিক' খোলা হয়েছে কলকাতার বুকে অনেকগুলো।

বিশেষ করে ধর্মতলা, বৌবাজার এবং এসপ্ল্যানেডের কাছাকাছি অঞ্চল সমূহেই এই শ্রেণীর সংবাহনাগারের সংখ্যা বেশি।

সুন্দরী যুবতী মেয়েদের এই সব ক্লিনিকে চাকরি দেওয়া হ'তো। ওরাই 'মাসেজ' করতো সমাগত-সৈনিক ও অ-সৈনিক পুরুষদের। 'মাসেজ' ব্যাপারটা নাকি মেয়েদের কোমল হাতেই খোলে ভাল!

অনেক কিছু ঘটনা এবং দুর্ঘটনার সংবাদ কানে আসতে লাগলো ঐ সব ক্লিনিকগুলো সম্বন্ধে। কেউ কেউ বলতো ওগুলো নাকি আইনসম্মত গণিকালয় ছাড়া আর কিছু নয়।

পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা হ'ল একদিন।

হ্যাঁ ভাল কথা। আমি তখন আর সেই শান্তশিষ্ট ভাল ছেলেটি নই। টু-পাইস আমদানি হওয়ার ফলে আমার তখন চোখ মুখ দুইই ফুটেছে। সাহিত্যিক আর সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে

মাঝে তখন 'বার' এবং আরও নানান জায়গায় গতায়াত শুরু করে দিয়েছি।

এক দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলি। কথা ছিল, সেদিন নিষিদ্ধ পল্লীর কোন এক তিলোত্তমার ওখানে যাওয়া হবে স্ফূর্তি করতে। দলে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। জনৈক ঝানু সাংবাদিক ও কোন এক সম্পাদক-কাম-কবিও এসে জুটলেন আমাদের দলে। শেষোক্ত প্রাণী দু'জন প্রায় আমার বাবার বয়সী। কিন্তু বয়স হ'লে কি হয়—ভিতরে ভিতরে ওঁরা তখনও রীতিমত কাঁচা। পরশুরামের ভাষায় 'দরকচা' মেরে যাওয়া।

রাত আটটার একটু পরে আমাদের দলটি গিয়ে হাজির হ'ল সেই বিশেষ স্থানটিতে। দু'এক কথার পরেই এসে গেল তরলায়িত বৈদেশিক সোমরস। সেটা শেষ হতেই ঝানুদা বললেন—বিলিতির বড্ড দাম, তার চেয়ে দিশী আনানো যাক।

কবিদা কাব্য করলেন—তা যা বলেছ ঝানু! "সাপোর্ট ইণ্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিজ"—ধেনোই ভাল।

দেড়া দামে ধান্যেশ্বরীই এলো তিন বোতল। খোলা যখন হ'ল, সে কি দুর্গন্ধ! বাপ্। অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায় সেই মদের দুর্গন্ধে।

কিন্তু আশ্চর্য! সেই বিকট দুর্গন্ধযুক্ত মালই কি করে বেমালুম হজম করে ফেলেছিলাম সেদিন।

কবিদা' তো দুই গ্লাশ টানবার পরেই বে-এক্তার হয়ে পড়লেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলেন তিনি।

এ রকম অভিজ্ঞতা শুধু একদিন নয় অনেক দিনই হয়েছিল আমার। সুতরাং অঙ্গ সংবাহনাগারের ভিতরে কি জাতীয় সংবাহন

চলে তা দেখতে যেতে আমার মোটেই বাধলো না। গুটি গুটি হাজির হলাম একদিন ঐ জাতীয় একটা ক্লিনিকে গিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই দেখি সামনে একটা দরজায় পর্দা টাঙানো। দরজার ওপরে আর একটা সাইনবোর্ডে ক্লিনিকের নাম লেখা আর তার ঠিক নিচেই একটি প্লাস্টিক-ফলকে উঁচু টাইপে লেখা "ওয়েল কাম"!

পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

ঢুকতেই দেখি ডান দিকে একটা অফিস। অফিসে একজন কোটপ্যান্টুল পরা বাঙালী সাহেব টেবিলের পেছনে একখানা রিভলভিং চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছেন।

অফিসের পাশেই টানা পার্টিশন। তাতে ছোট ছোট চেম্বার। সংখ্যায় বোধ হয় সাত আটটা হবে। দু'টো চেম্বারের দরজা বন্ধ দেখলাম। বাকিগুলো খোলা। খোলা চেম্বারগুলোর প্রত্যেকটার সামনে একজন করে নার্স বসে।

আমাকে দেখেই নার্সরা নড়ে চড়ে বসলো।

ওদের মধ্যে একজনের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমি মাসেজ করাতে চাই!

নার্সটি মৃদু হেসে বললো—আসুন।

বললাম—ফীজ কত?

উত্তরে মেয়েটি বললো—প্রতি পনের মিনিটে পাঁচ টাকা।

—টাকাটা কি অফিসে জমা দিয়ে আসতে হবে?

—না দিলেও চলবে। আমার হাতে দিলেই হবে।

আর কোন কথা না বলে সেই নার্সের সঙ্গে একটা চেম্বারে ঢুকে পড়লাম।

ভিতরে ঢুকতেই মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল।

লক্ষ্য করলাম, মাসেজের সব রকম উপকরণই আছে সেই চেম্বারে। একখানা খাট, একটা 'ওয়াস বাসিন', 'টাওয়েল স্ট্যাণ্ড', সাবান, তোয়ালে এবং আরও অনেক কিছু।

নার্স বললো—জামা খুলে খাটের ওপর শুয়ে পড়ুন।

আমি বললাম—টাকাটা নেবেন না ?

—আচ্ছা দিন।

পাঁচ টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললাম—আপনাদের কি রকম মাইনে দেন এঁরা ?

—মাইনে খুব বেশি পাই না। মাত্র ষাট্ টাকা। তবে পেসেণ্টরা যদি 'একস্ট্রা' কিছু বকশিস্ দেন, সেটা আমরাই পাই। তাছাড়া···

—তাছাড়া কি ?

—তাছাড়া যে নার্স প্রথম পনের মিনিটের পরেও পেসেণ্টকে রাখতে পারে সে একটা কমিশনও পায়। পরবর্তী সময়ের জন্য যে 'ফীজ' পাওয়া যায় তার 'টুয়েন্টিফাইভ্ পারসেণ্ট' নার্সরা পায়।

নার্সের কথা শুনে আমার যা বুঝবার সবই বুঝে নিলাম।

যাই হোক, আসবার সময় মেয়েটিকে পাঁচ টাকা 'একস্ট্রা' দিয়ে এসেছিলাম সেদিন। মেয়েটি বলেছিল—আবার আসবেন তো ?

এর পর আরও অনেকবার অনেক ক্লিনিকে গেছি আমি। ছু'এক জায়গায় আবার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সও দেখেছি। তবে সে সব ক্লিনিকের 'রেট' ছিল বেশি। প্রতি পনের মিনিটে দশ টাকা।

জীবনের সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম টাকা রোজগারের সেই সহজতম পদ্ধতি দেখে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছিল যে, কি করে এসব ব্যবসা চালাতে দেওয়া হচ্ছে ?

এমনি ভাবে যখন আমার জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় হঠাৎ একটা 'অঘটন সংঘটন' হ'ল। সহসা বিয়ে হয়ে গেল আমার। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, বিয়ের ঘণ্টা দুই আগেও আমি জানতাম না। এক সাংবাদিক বন্ধুর মামাতো বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বিয়ের সব-কিছু প্রস্তুত, হঠাৎ খবর এলো যে, ঐ দিনই সকালবেলা মোটর 'এ্যাক্সিডেণ্টে' বর মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উৎসবের কলহাসি কান্নার রোলে পরিবর্তিত হয়ে গেল। একটু পরেই আমার সেই সাংবাদিক বন্ধুটি আমার কাছে এসে বললো—ভাই, এ বিয়ে তোমাকেই করতে হবে ! নইলে মামার জাত যায়।

আমি অবাক হয়ে গেলাম বন্ধুর কথা শুনে। বললাম—আমি··· মানে বিয়ে···কি বলছো তুমি ?

বন্ধুটি বললো—ঠিকই বলছি ভাই। তাছাড়া আমার বোন কোন দিক দিয়েই তোমার অনুপযুক্তা নয়।

এই বলে অতি সংক্ষেপে বন্ধুটি তার মামা এবং তাঁর কন্যার যে পরিচয় দিল তাতে অমত করবার মতো কোন কারণই দেখতে পেলাম না আমি।

রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব দেওয়ার প্রস্তাব এলো বন্ধুর মামার তরফ থেকে।

এর আধঘণ্টা পরেই আমি একেবারে বরের পিঁড়িতে।

॥ সাত ॥

সত্যিই রাজ-কন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে গেলাম। শ্বশুর মশাই মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরী করে মাসে হাজার পাঁচেক টাকা রোজগার করছিলেন। সুতরাং জামাইকে যে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন এতে আর আশ্চর্য কি!

নগদই লভ্য হ'ল পাঁচ হাজার।

বত্রিশ টাকার বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা শ্রীসত্যব্রত মিত্র তখন ষাট টাকার ফ্লাটে উঠে গেল। বাড়িতে ঠাকুর, চাকর, ঝি। একেই বোধ হয় বলে "স্ত্রী ভাগ্যে ধন।"

স্ত্রীর নাম লেনেকা।

'রাশিয়ান ব্র্যাণ্ড' নাম। তা হোক। নামটা কিন্তু বেশ। তাছাড়া নামের অধিকারিণীও বেশ।

শিক্ষিত যুবক যে রকম স্ত্রী আশা করে, লেনেকা তার চেয়েও একটু বেশি—অর্থাৎ সুন্দরী, শিক্ষিতা ও নৃত্যগীত পটীয়সী।

মনের আনন্দে রঙীন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াই লেনেকাকে নিয়ে। ট্যাক্সি ভাড়াই ওঠে দশ থেকে পনের টাকা কোন কোন দিন।

কলকাতা শহর তখন 'ব্ল্যাকআউট'এর 'বোরখা' পরে সম্ভ্রান্ত

মুসলমানের ঘরের সুন্দরী বধূর মতো নিজেকে ঢেকে ফেলেছে আষ্টেপৃষ্টে।

কিন্তু শহরের রোশনাই মুখ ঢাকা দিলেও আমার মনের রোশনাই তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শ্যালিকাদের মালিকায় পরিবৃত হ'য়ে লেনেকাকে নিয়ে যখন সিনেমায় বা রেষ্টুরেন্টে যেতাম, তখন অনেক যুবককেই দেখতাম আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে। সুন্দরী স্ত্রী আর তার বোনদের নিয়ে বেড়াতে বের হ'লে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর আনন্দের অনুভূতি হয়—বিশেষ করে পকেটে যদি খরচ করবার মতো টাকা থাকে।

নারী সঙ্গ-লাভের মোহময় মাদকতা পুরুষকে পাগল করে তোলে ; তাই সে তার স্ত্রীকে শুধু ঘরের মধ্যে আটকে রেখে রাত্রের শয্যাসঙ্গিনী করেই তৃপ্তি পায় না, সে চায় তাকে উপভোগ করতে এবং তার রূপকে উপভোগ্য করতে। স্ত্রীর রূপের জৌলুস যদি পরকেই না দেখানো গেল তাহ'লে আর আনন্দ কোথায় ?

কথাটা সোজাসুজি বলে ফেললাম। হয়তো অনেকে মনে মনে চটে যাবেন আমার ওপরে। প্রকাশ্যে গালাগাল দেবেন বিকৃত-রুচি বলে। কিন্তু মুখে যাই বলুন, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'বেন যে, আমার কথার মধ্যে অতিরঞ্জন খুব বেশি নেই।

বেশ আনন্দেই কাটছিল দিনগুলি।

লেনেকার কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমিয়ধারা আমার মনে যে অপূর্ব প্রশান্তি এনে দিত সে কথা ভাবলে আজও মনটা কেমন হয়ে যায়।

মনে পড়ে একদিন ওকে নাচতে বলায় কি রকম মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠেছিল। বলেছিল—হ্যাঁ, ঝি চাকরদের সামনে আমি এখন ধেই ধেই করে নাচ শুরু করে দিই ! ছিঃ !

কিন্তু আমি জানতাম যে, মাত্র কয়েক মাস আগেও লেনেকা হাজার লোকের সামনে নেচেছে 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট'এ !

তাই ওর প্রত্যাখ্যানে আহত কণ্ঠে বলেছিলাম—তা আমার সামনে নাচবে কেন ? আমি তো আর তোমার···

আমার মুখের কথা শেষ না হতেই লেনেকা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল···যাও ! তুমি যেন একটা কি ! ঝি চাকরদের সামনে নাচতে লজ্জা করে না ?

আমি বললাম—ওদের না হয় কোন কাজে পাঠিয়ে দিই। চাকরকে বাজারে আর ঝিকে তোমার বাপের বাড়িতে পাঠাই তোমার বোনকে খবর দেবার ছল করে, কেমন ?

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

ঝি-চাকর চলে গেলে ও পোশাক পরতে লাগলো। আমার সামনেই। পোশাক পরতে পরতে বললো—সঙ্গৎ ছাড়া কি নাচ হয় নাকি ?

এমনি ভাবেই কাটছিল তখনকার দিনগুলি। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, যাকে বলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ !

এই সময় একদিন বাবা এলেন আমার ওখানে। বললেন—একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছি খোকা।

খুবই খুশি হ'লাম বাবা আসতে। লেনেকাও খুশি হ'ল।

বিয়ের পর শ্বশুরকে সে যত্ন করবার সুযোগই পায়নি এত দিন। না পাবার কারণ অবশ্য বাবার চাকরী। কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোন এক ছোট শহরে তিনি তখন সাব-রেজিস্ট্রার। গাদা গাদা 'দলিল দস্তাবেজ'এর মোটা মোটা কেতাব নিয়ে দিন কাটে তাঁর।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার মা বেঁচে ছিলেন না। আমি যখন খুবই ছোট, সেই সময়ই তিনি মারা যান। বাবা থাকতেন ঠাকুর চাকর নিয়ে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক মাস। কর্ম্মস্থলে ফিরে যাবার সময় এসে গেল বাবার।

যাবার আগের দিন আমাকে আর লেনেকাকে ডেকে অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। বললেন, আর চারটে বছর পরেই রিটায়ার করবেন, তারপর পেন্সন 'কম্যুট' করে সেই টাকায় কলকাতার উপকণ্ঠে একখানা ছোট বাড়ি করবেন। বাকি জীবনটা সেই বাড়িতেই কাটাবেন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তখনও আমরা জানি না যে, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বাবা চলে যাবার মাসখানেক পরেই একদিন টেলিগ্রাম পেলাম—"ইয়োর ফাদার ডায়েড্ অব হার্ট ফেলিওর ইয়েস্টারডে।"

টেলিগ্রামটা পেয়েই শোকে মূহ্যমান হ'য়ে পড়লাম আমরা। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সেই দিনই রওনা হ'লাম বাবার কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে। গিয়ে শুনলাম—এজলাসে বসে কাজ করতে করতেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার আসবারও সবুর সয় নি। তার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর।

দুঃখে বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠলো আমার। ছেলে বেঁচে থাকতেও তার হাতের মুখাগ্নি তিনি পেলেন না!

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আবার আরম্ভ হ'ল খবর কুড়িয়ে বেড়ানো। কাজের ভিড়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম আমি।

কলকাতায় তখন কড়া ব্ল্যাক-আউট। জাপানী বোমার ভয়ে এ, আর, পি ব্যবস্থায় দারুণ তোড়জোড়।

জাপানীদের অগ্রগতির খবর আসছে দিনের পর দিন।

সোনান (সিঙ্গাপুরের জাপানী নাম) রেডিও থেকে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের ঘোষণাবাণী শুনতে লাগলাম দিনের পর দিন—This is the Provisional Government of Azad Hind, Sonan Broadcasting Station Calling"

এই বলে আরম্ভ করে নেতাজীর অগ্রগতির নানা খবর বলা হ'ত সেখান থেকে।

হঠাৎ এই সময় বোমা পড়লো কলকাতায়।

হাতিবাগান, ডালহৌসি স্কোয়ার আর খিদিরপুরে বোমা ফাটলো।

সাদা-হলদে-লাল এর সংকেত (White, Yellow & Red signal), জাপানীদের অগ্রগতি, বার্মার পতন—এসব খবর জানা থাকলেও সত্যি সত্যিই যে কলকাতায় বোমা পড়বে তা কিন্তু ভাবতে পারিনি।

দলে দলে লোক পালাতে লাগলো কলকাতা থেকে।

ভীত হয়ে উঠলেন আমার বড়লোক শ্বশুর। নিজের পরিবারের সঙ্গে লেনেকাকেও তিনি নিয়ে গেলেন নিরাপদ দূরত্বে। আমাকেও বললেন চাকরী ছেড়ে দিয়ে ওঁদের সঙ্গে যেতে।

আমি কিন্তু গেলাম না। লেনেকাকে ছেড়ে থাকবার মতো নিদারুণ ত্যাগ স্বীকার করে চাকরীতেই থেকে গেলাম আমি। এ যে কতবড় ত্যাগ স্বীকার তা কেউ বুঝলো না—এমন কি আমাদের পত্রিকার মালিকও বুঝলেন না তা।

অমন সুন্দরী বউ যার—তার ওপরে যার শ্বশুর ইচ্ছা করলেই তিন চার'শ টাকা মাইনের চাকরী যখন তখন দিতে পারেন, তা সত্ত্বেও যে আমি খবরের কাগজের চাকরীতে রয়ে গেলাম স্ত্রীর সঙ্গে না গিয়ে, এই ত্যাগের কথাটা আর কেউ না বুঝুক, পত্রিকার মালিকের বোঝা খুবই উচিত ছিল; আর তা বুঝে আমার মাইনে বাড়িয়ে অন্ততঃ চার'শ টাকা করে দেওয়া উচিত ছিল।

যাই হোক, যা হ'ল না তা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

আমি তখন প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বিরহ যাপন করতে লাগলাম আর ডাক বিভাগকে সাহায্য করতে লাগলাম লেনেকাকে দৈনিক ছু'খানা করে চিঠি লিখে।

॥ আট ॥

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন বাইরের টানটা বন্ধ ছিল। কিন্তু লেনেকা চলে যেতেই আবার সেই পুরোনো ব্যাধিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

মানসিক ব্যাধি নিরাময় করতে মাসেজ ক্লিনিকে যাব ঠিক করে সেদিন বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে হাঁটা শুরু করেছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম, সবুজ জর্জেটের শাড়ি পরে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে একটি বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের মেয়ে একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

বাড়িটার দোতলায় সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম—"সায়েন্টিফিক মাসেজ এ্যাণ্ড বাথ্"।

মেয়েটির দিকে তাকাতেই মনে হ'ল ওকে যেন চিনি। একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলাম। ও সেই যমুনা বৌদি।

কথা বলতে ইচ্ছা হ'ল ওর সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললাম—চিনতে পারো ?

আমাকে দেখে ও প্রথমটা চম্‌কে উঠলেও পরক্ষণেই মনের ভাব গোপন করে বললো—ঠাকুরপো যে ! ভাল আছ তো ?

বললাম—তা এক রকম ভালই। তুমি এখন কি করছো ?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ও বললো—চলো একখানা রিক্সা করি ! রাস্তায় চলতে চলতে কথা বলা, সে ভারী বিশ্রী।

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে রিক্সায় চড়ি আর তোমার মা ছুটে এসে চেঁচিয়ে লোকজন ডেকে খেসারৎ আদায় করুক!

—সে কথা আজও ভোলনি ঠাকুরপো?

—সে কি ভোলবার কথা? যাক্, এখন আর আমার আগের মতো ভয় নেই। রিক্সা কেন, চল ট্যাক্সিতেই যাই!

—ট্যাক্সিতে যাবে ঠাকুরপো! তা'হলে আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছো?

—তা শ' পাঁচেক টাকা হয় বৈ কি মাসে।

—পাঁচ'শ টাকা পাচ্ছো! কোথায় কাজ করছো এখন?

—খবরের কাগজের অফিসে। তাছাড়া বইও লিখি আমি। পড়োনি আমার বই?

যমুনা হেসে বললো—বই পড়বো! তা'হলেই হয়েছে! লেখা-পড়াই যদি জানবো তাহলে কি আর···

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গেল ও।

একখানা চলমান ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে উঠে পড়লাম দু'জনে।

বললাম—কোথায় যেতে চাও?

ও বললো—যেখানে খুশি।

ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম—আউটরাম ঘাটে চলো!

চলতে চলতে বললাম—তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিছুদিন আগে।

—তাই নাকি! কি বললো মা?

—কিছুই না। আমাকে দেখে তিনি যেন সরে পড়তে পারলে বাঁচেন।

এই কথার উত্তরে যমুনা শুধু "হুঁ" বলে চুপ করে গেল

আউটরাম ঘাটের সামনে নেমে ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বৌদির হাত ধরে কাঠের পুলটার ওপর দিয়ে চলতে চলতে বললাম —এখানে এসেছো কোনদিন?

—এসেছি বৈ কি! যে কাজ করছি তাতে সব জায়গাতেই যাওয়া হয়ে গেছে আমার!

আর কোন কথা না বলে দোতলায় উঠে এক কোণে নির্জন দেখে একখানা টেবিল দখল করে চা আর পেষ্ট্রী আনতে হুকুম করলাম বয়কে।

চা আনতে কিছুটা দেরী হবে জানতাম, তাই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললাম—প্রায় চার বছর পরে দেখা, তাই না?

বৌদি বললে—হ্যাঁ।

—তুমি ম্যাসেজ ক্লিনিকে কাজ করছো এখন?

—কি আর করি বলো? বেঁচে থাকতে হবে তো?

—তোমার মা তোমার সঙ্গেই আছেন তো? প্রশ্নটা কেন যেন বেরিয়ে এলো মুখ থেকে।

ও বললো—না। মা আলাদা হয়ে গেছেন।

—কেন! তুমি এই কাজ করছো বলে?

—মনে কর তাই-ই।

—তার মানে?

—মানে আবার কি! সবাই সবার বেঁচে থাকবার পথ দেখে নিয়েছে আর কি।

—ওঁকে তুমি যেতে দিলে কেন ?

—আমি যেতে দেব কেন, উনি নিজেই গিয়েছেন।

—কি করছেন উনি এখন ?

—সে কথা নাই বা শুনলে।

—কেন বলো তো ?

—সে তোমার না শোনাই ভাল।

এই সময় বয় চায়ের পট্‌ আর পেষ্ট্রি সাজানো প্লেট এনে টেবিলে রেখে গেল। বৌদি বললো—আমিই চা-টা করে দিই, কেমন ?

বললাম—দাও।

বৌদি বেশ নিপুণ হাতেই চা তৈরি করে আমার দিকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে বললো—খাও।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমার কথার জের টেনে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কৈ, বললে না ?

—বললুম তো! সে কথা শুনে তোমার কোন লাভ নেই। উনি এখন অন্য লোকের সঙ্গে আছেন।

কথাটা শুনে চুপ করে গেলাম আমি।

একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা বৌদি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তোমাকে ?

—সেদিনের সেই কথা তো ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে বিশ্বাস করো ঠাকুরপো। মায়ের সঙ্গে যুক্তি করে আমি ও রকম করিনি তোমার সঙ্গে।

—তবে ?

—আমি দোষ করেছিলাম ঠিকই। বাড়িওয়ালার তাগাদায় আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাই ভেবেছিলাম তোমাকে খুশি করলে হয়তো টাকাটা তুমি দেবে।

—সত্যি বলছো ?

—এতদিন পরে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ ? তাছাড়া ও ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলবার মতো দুর্বলতা আজ আর আমার নেই।

—কিন্তু তোমার মা যে বলেছিলেন পাঁচ জন সাক্ষী ছিল।

—সব মিথ্যে কথা ঠাকুরপো। সাক্ষী টাক্ষী কেউ ছিল না। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় জানো তো! তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করবার মতলবেই মা সেদিন ঐ রকম করেছিলেন।

প্রসঙ্গ বদলাবার উদ্দেশ্যে আমি বললান—যতীনের কোন খবর জানো ?

—না।

চা খেতে খেতে বৌদি আবার বললো—আমি কোথায় আছি জিজ্ঞেস করলে না ঠাকুরপো ?

—না।

—তবুও শুনে রাখ। আমি এখন······নং রামবাগানে থাকি। পুরোদস্তুর······

"বেশ্যা" কথাটা বলতে গিয়েও মুখে আটকালো ওর।

আমি চুপ করেই রইলাম, কারণ এইরকম একটা কিছুই আমি আঁচ করেছিলাম।

ও বলে চললো—আচ্ছা বলতে পারো ঠাকুরপো, এসব আমরা

কেন করছি ? নীতিবাগীশরা আমাদের দোষ দেয়, কিন্তু তুমি দেখিয়ে দাও তো আমাদের অপরাধ কোথায় ? দিনের বেলা আমাদের দেখলে যারা ঘৃণায় নাক সিঁটকায়, তারাই হয়তো রাতের বেলায় আসে আমাদের ঘরে। অভাবের তাড়নায় যখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম, সময় মতো ঘর ভাড়া দিতে পারতাম না, তখন কিন্তু আমার জিনিসপত্তর টেনে রাস্তায় বের করে দিতে বিবেকে বাধতো না পুরুষমানুষদের। জানো ঠাকুরপো কত দুঃখে এই পথে পা দিতে বাধ্য হয়েছি ?

এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বললো—তাইতো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, কেন এমন হয় ?

বলবার কিছুই ছিল না তাই চুপ করে রইলাম।

—কি, কথা বলছো না যে ?

—কি বলবো বলো ? কত দেশ বিদেশের মহা মহা পণ্ডিত লোকেরাও যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, আমি সে প্রশ্নের কি উত্তর দেবো ?

—কেন, দেহ বিক্রি করা ছাড়া কি মেয়েদের ভালভাবে—ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার কোন উপায়ই নেই ?

—আছে বৈ কি ! আজকাল কত মেয়ে অফিসে, হাসপাতালে, টেলিফোনে চাকরি করছে দেখছো তো ?

—দেখছি বৈ কি। ওরা সবাই যে লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে যারা পারে না, ধরো এই আমার মতো অসহায় যারা, তারা কি করতে পারে ?

—তাদের পক্ষে বিয়ে করে সংসার করাই ভাল।

—সে চেষ্টাও কি করিনি ঠাকুরপো ? করেছি যে, তা তো তুমি

ভাল করেই জানো। কিন্তু আজ আমি কোথায়? বাপ মা যদি পয়সার অভাবে লেখাপড়া শেখাতে না পারে বা ভাল ঘরে বিয়ে দিতে না পারে, তাহলে সেই হতভাগ্য মেয়েদের কি হবে বলতে পারো ঠাকুরপো?

কি উত্তর দেব আমি ওর এই মহাজিজ্ঞাসার? এ প্রশ্ন যে আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন নির্যাতিতা নারীর। এ প্রশ্নের বোধহয় উত্তর নেই।

কাপ দুটো কখন খালি হয়ে গিয়েছিল। বয়কে দাম মিটিয়ে দিয়ে ওখান থেকে বাইরে নেমে এলাম। গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়াও যেন ভারী মনে হচ্ছিলো এতক্ষণ। রাস্তায় এসে বললাম—ট্যাক্সিতে যাবে তো?

বৌদি বললো—কি দরকার? চলো, এই পথটুকু গিয়ে হাইকোর্ট থেকে ট্রামে উঠব।

চলতে চলতে এক সময় হঠাৎ ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার বিয়ে হয়েছে ঠাকুরপো?

—তা হয়েছে।

—ছেলে মেয়ে?

—এখনও হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বললো—তোমার বউকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে ঠাকুরপো।

এই কথা বলেই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো ও।

বললাম—কি, হাসলে যে বড়?

—হাসি পেলো তাই। তুমিই বলো না, যত সব বাজে কথা

বলে তোমাকে শুধু শুধু বিব্রত করছি। আজ তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ?

'ট্রাম ষ্টপেজ'এর-কাছে এসে পড়েছি।

একখানা ট্রাম আসছে—হ্যারিসন রোড হয়ে শিয়ালদা।

বৌদি বললো—তুমি পরের ট্রামে এসো, আমি চললাম।

এই বলেই ট্রামে উঠে পড়লো ও।

আমি অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে সিগারেট 'বের করে ধরিয়ে টানতে লাগলাম।

॥ নয় ॥

এর কিছুদিন পরেই আরম্ভ হয়ে গেল মহা মন্বন্তর। মানুষের সৃষ্টি অমানুষিক মারণ-যজ্ঞের সে এক করুণতম কাহিনী। যুদ্ধবাজ আর অর্থপিশাচদের যুগপৎ আক্রমণে বাংলার বুকে নেমে এলো দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী দু'মুঠো ভাতের অভাবে ছুটে আসতে লাগলো মহানগরীর বুকে।

কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্রিটিশ-তাঁবেদার ভারত সরকার শুরু করলেন টাকার খেলা। টাকা দিয়েই সাহায্য কিনতে চাইলেন সরকার। লক্ষ লক্ষ বিদেশী সৈনিকে তখন ভরে গেছে দেশ। জাপানীদের রুখবার জন্য আমদানি হয়েছে লক্ষ লক্ষ মার্কিন, ইংরেজ, কানাডিয়ান, নিগ্রো আর কাফ্রী সৈন্য। ভারতীয় সৈন্যও রিক্রুট করা হয়েছে বহু লক্ষ। এই সব সৈন্যদের ভরণ পোষণের জন্য দরকার অজস্র খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ আর তাদের দিয়ে যুদ্ধ করাতে হলে চাই প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি আর সাজ-সরঞ্জাম; আর এই সব জিনিস জোগাড় করতে প্রয়োজন টাকার।

ফলে বস্তা বস্তা নোট ছাপা হতে লাগলো সরকারী ছাপাখানায়। অর্থনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিলাতে জমা 'স্টার্লিং ব্যালান্স'কে জামীন রেখে চললো কোটি কোটি টাকার নোট ছাপা। এই ভাবে

পর্বত প্রমাণ নোট ছাপার ফলে টাকার দাম গেল মাটি হয়ে আর জিনিসপত্রের দাম উঠলো আগুন হয়ে। এই মরশুমে একদল সুযোগ সন্ধানী অর্থপিশাচ খাদ্য শস্য লুকিয়ে ফেলে মুনাফা লুঠবার এক সহজ ও মারাত্মক পথ আবিষ্কার করে ফেললো।

অন্যদিকে জাপানী আক্রমণের ভয়ে বাংলার শস্যশ্যামলা উপকূল-ভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ চাষী পরিবারকে উৎখাৎ করে সেই সব জমিতে মোতায়েন করা হ'ল রক্ষী-বাহিনী। শত্রুর বিমান-বাহিনীকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে তালগাছের গুঁড়ি কেটে ইতঃস্ততঃ বসানো হ'ল "এন্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গান"। ধানের জমিতে তালগাছ বসাবার ফলও হাতে হাতেই ফলতে শুরু করলো। ঐ সব তালগাছের তাল এসে পড়তে লাগলো হতভাগ্য বাঙালী জাতির মাথায়। লক্ষ লক্ষ চাষী নরনারী খিদের জ্বালায় ছুটে আসতে লাগলো কলকাতার দিকে। "মা এ্যাক্‌টু ফ্যান দেও!" "মা তুখানা পোড়া রুটি দেও" রবে শহরের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

সাহস করে 'ভাত দাও' কথাটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারতো না ওরা! মানুষ হয়ে মানুষের মতো বেঁচে থাকবার দাবী নিয়ে যাদের দাঁড়াবার কথা, তারা এসে দলে দলে প্রাণ দিতে লাগলো ভিখিরীর মতো ফ্যান ভিক্ষে চেয়ে। মনুষ্যত্ব কেঁদে মরলো অমানুষের তুয়ারে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের বিনিময়ে চললো অমানুষদের অমানুষিক মুনাফা-শিকার।

তুমুঠো ভাতের লোভ দেখিয়ে সুন্দরী মেয়ে আর বউদের নিয়ে গেল গণিকা পল্লীর দালালরা তাদের অক্ষম বাপ আর স্বামীদের চোখের সামনেই। ধনীর প্রাসাদের নীচে ফুটপাতের ধূলায় জন্ম নিল ভবিষ্যতের নাগরিক।

কী হৃদয়হীন বর্বরতা দেখেছি সেদিন! রণক্ষেত্রে মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ সেই ক্ষুধাতুর কঙ্কালদের মরণ-মিছিল। মনের ভিতরের দেবতা রুখে উঠতে চাইতো নিষ্ফল আক্রোশে। মন কেঁদে বলতো— এ অন্যায়! এ অন্যায়!

শহরের 'রকবাজ' ছেলেদের আড্ডা ভেঙেছে। এ, আর, পি আর সিভিক গার্ড-এর চাকরি পেয়ে খাকী শার্ট আর প্যাণ্টুল পরে হাফ্-সৈনিক বনে গেছে তারা।

'ব্ল্যাক-মার্কেট' আর 'ব্ল্যাক-মার্কেট'।

সর্বত্রই 'ব্ল্যাক'! সামনের দিকে তাকালে কালো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

বিনোদিনী বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে সৈন্যদের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে। বেশ্যাপল্লীর মেয়েদের নিয়ে নাচ দেখানো হচ্ছে সৈনিকদের। 'উইমেনস্ অক্জিলিয়ারী কোর'এ ভর্তি হয়েছে অগণিত মেয়ে। যুদ্ধের সময়কার পয়সা যে যেদিক দিয়ে পারছে লুঠে নিতে চেষ্টা করছে।

মাসিকে আর দৈনিকে,

খাকীপরা সৈনিকে,

মায় 'গ্যারেজ'-এ পর্যন্ত চলেছে টাকা খরচের আর টাকা রোজগারের 'প্যারালাল স্ট্রেট্ লাইন'।

খবর আসতে লাগলো, রাস্তা থেকে কার বোনকে নাকি তুলে নিয়ে গেছে সৈন্যরা। কোথায় নাকি এক পল্লীর মধ্যে কোন্ মেয়ের পেছু নিতে গিয়ে পাড়ার সৈনিকদের হাতে প্রাণ দিয়েছে কোন সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েই প্রাণ দিয়েছে সে।

খবর আর খবর।

যুদ্ধবাজদের নামগুলো মুখস্ত হয়ে গেছে দেশের মানুষদের। চায়ের দোকানে চলে রণনৈতিক গবেষণা।

"ইস্, কি ভুলটা করলে মাইরি হিটলার!"

"ইংল্যাণ্ড আক্রমণ না করে বেটারছেলে গেল কি না রাশিয়া আক্রমণ করতে, গেরো আর বলে কাকে!"

"কাউন্ট সিয়ানোটা বেজায় শেয়ানা, কি বলিস?"

খবরের কাগজ খুলে বসে আলোচনা চলে তরুণদের ভিতরে।

রাত নটায় সিঙ্গাপুর বেতারে আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা আর প্রোগ্রাম শুনতে বসে তারা।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হ'ল—"জাপানী প্রোগ্রাম শুনলে কড়া সাজা হবে।"

খবরের কাগজের কাট্‌তি বেড়ে গেছে অসাধারণ ভাবে।

আমাদের পত্রিকায় তখন রোটারী মেসিন বসেছে। কম্পোজ হচ্ছে লাইনো টাইপ মেসিনে।

টেলিপ্রিণ্টারে খবর আসছে মিনিটে মিনিটে।

নিউজ সেক্সনে (বার্তা বিভাগে) তর্জমা চলছে ভীম বেগে।

কাজ বেড়ে গেছে তখন প্রত্যেক বিভাগে। নতুন নতুন বিভাগও খোলা হয়েছে কয়েকটা।

বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট 'তির্য্যক', আর 'ফিচারিস্ট' (ফিচার লিখিয়ে) 'বেমালুম'ও এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের কাগজে।

মোট কথা, হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার চলছে তখন আমাদের পত্রিকায়।

কলম আর কালির সাহায্যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে চলেছি আমরা।

ওদিকে ইয়োরোপের যুদ্ধের মোড় তখন ঘুরে গেছে। স্তালিনগ্রাদে মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে লালফৌজ।

হঠাৎ খবর এলো স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মাণদের ভাগ্য বিপর্যয়ের।

তারপর থেকেই চললো লালফৌজের অগ্রগতি।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে লালফৌজ। পাইকারী পশ্চাদ-পসরণ শুরু হ'ল হিটলারী বাহিনীর।

বাংলায় কণ্ট্রোলিত চাল, গম, আটা, চিনি রেশনিত (Rationed) হয়েছে। চালের দাম প্রতি সের ছ'আনা। কালো-বাজারের কারবারীদের জয়-জয়কার চলছে। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে কালোবাজারের কল্যাণে। দোকানদাররা এমনই গরম যে তাদের ল্যাজে হাত দিলেই ফোস্কা পড়ে যায় হাতে। এক টাকার মালে, চার টাকা লাভ—গরম হবেই-বা না কেন ?

চারদিক থেকে রব উঠেছে—"টাকা চাই, আরও টাকা।" মুনাফা লুঠবার এমন সুযোগ আর যদি না পাওয়া যায় তাই ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা দু'হাতে টাকা লুঠতে চায়। বেশি দামে মাল বেচেও খুশি হয় না ওরা—মালে ভেজাল চালাতে থাকে পুরোদমে।

ময়দায় সোপস্টোন, চালে কাঁকর, বার্লিতে, সাগুতে, কুইনাইনে, এমন কি আলকাতরায় পর্যন্ত ভেজাল চলতে থাকে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দেহরক্ষা করেছেন ওখানকার রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরেছেন ট্রুম্যান সাহেব।

পূর্ব রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি এগিয়ে চলেছে জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের অধিনায়কত্বে।

আণবিক বোমা-বিদীর্ণ হ'ল হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে।

দুই বোমার গুঁতোতেই জাপান ঘায়েল।

সামাল সামাল রব উঠলো সেখানে। জাপান আত্মসমর্পণ করলো।

ওদিকে লালফৌজ অধিকার করে নিয়েছে বার্লিন নগরী।

সুবিখ্যাত 'রাইখস্ট্যাগ'এর শীর্ষে উড়ছে 'কাস্তে হাতুড়ী মার্কা' লালঝাণ্ডা। যুদ্ধের সেই শেষ পর্যায়ে আবার এক. ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনী প্রচারিত হ'ল। ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হের হিটলারের প্রেম ও বিবাহের খবর যুদ্ধের খবরকেও ছাপিয়ে গেল।

তার পরেই সব শেষ।

যুদ্ধ খতম!

'লড়াই ফতে'র আনন্দে দুনিয়া তোলপাড়।

॥ দশ ॥

সংবাদ জগতে যখন এই অবস্থা আমার নিজের সংবাদ কিন্তু তখন সুবিধার নয়। যমুনাবৌদির ঠিকানাটা কি কুক্ষণেই সেদিন শুনে ফেলেছিলাম। ও যখন ট্রামে উঠে চলে গেল তখন থেকেই ওর ওপরে কেমন যেন মায়া হ'ল আমার। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কে যেন বলে উঠলো—আহা বেচারা!

রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে ওর কথাই শুধু মনে হয়েছিল সেদিন। ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকে আরম্ভ করে হিদারাম সরকার লেনের বাড়ির সেই ঘটনার কথা—সব কিছু আমার মনের পর্দায় নির্বাক চলচ্চিত্রের ছবির মতো ভেসে উঠছিল। বার বার ওর সেই কথাটা মনে হচ্ছিল—"তুমি বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, মার সঙ্গে যুক্তি করে ও কাজ আমি করিনি।"

পর দিনই আমি হাজির হয়েছিলাম ওর ডেরায়। রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রামবাগানের গলি থেকে ওকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয় নি আমার।

যে অবস্থায় যমুনা বৌদিকে সেদিন দেখেছিলাম, তা লিখতে কলম সরছে না। আট দশটি মেয়ের সঙ্গে সাজসজ্জা করে শিকার ধরবার ফাঁদ পেতে সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিল ও।

বুকটা কেন যেন কেঁপে উঠলো আমার। একবার মনে হ'ল,

এ আমি কোথায় এলাম! এর আগে ছ'চারবার এ পাড়ায় এলেও তখন এসেছি দলের সঙ্গে। দল বেঁধে এসে ফূর্তি করে আবার দল বেঁধেই চলে গিয়েছি। কিন্তু এবার এক নূতন অনুভূতির সৃষ্টি হ'ল আমার মনে। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো ছুরু ছুরু করে।

অন্ধকারে আমার মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না বলে ও আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। আমি সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সবাই। প্রত্যেকেই হয়তো ভেবেছিল—তাকেই পছন্দ করেছি আমি।

আমি কিন্তু কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম যমুনার সামনে।

আমাকে দেখে হতবাক্ হয়ে গেল যমুনা। ও বোধ হয় ধারণাই করতে পারে নি যে, আমাকে ওখানে দেখতে পাবে।

মাটির দিকে চেয়ে ও বললো—ঘরে চলো।

ঘরে ঢুকে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। মনে হ'ল, আমি আজ অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে এসেছি। আমাকে নির্বাক দেখে বৌদি বললো—কী ব্যাপার? চুপ করে গেলে যে! ভাল হয়ে বসো।

সুবোধ বালকের মতো আদেশ পালন করলাম।

কিন্তু আমি যেন কিছুতেই সহজ ভাবে কথা বলতে পারছিলাম না ওর সঙ্গে। মনের মধ্যে কে যেন বল্লমের খোঁচা দিয়ে বলছিল: "যমুনার এই দশার জন্য তুমিই দায়ী···তুমি যদি ওর খোঁজ খবর নিতে, তাহলে ওকে আজ এখানে আসতে হ'ত না।"

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে এসেছ কতদিন?

—তা প্রায় ছু'বছর হয়ে গেল।

—ও বাড়ি থেকে কবে চলে এসেছিলে?

—ও বাড়ি মানে হিদারাম সরকার লেনের সেই বাড়ি তো? তুমি চলে যাবার মাস খানেক পরেই ওখান থেকে চলে যাই আমরা।

—তারপর?

—তারপর আর এক খোলার বাড়িতে উঠি। তোমার কাছ থেকে আদায় করা সেই এক'শ টাকার মধ্যে আশী টাকার মতো তখনও আমাদের হাতে ছিল। ঐ নিয়েই নতুন করে জীবন আরম্ভ হ'ল। বে-ওয়ারিশ ছুটি মেয়েছেলেকে দেখে দলে দলে শুভানুধ্যায়ীরা আসতে লাগলো। উদ্দেশ্য—বুঝতেই পারো!

—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই। মাস কয়েক বেঁচে থাকবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করলাম। নানা ভাবে মানে, মা ঠোঙা তৈরি করতেন, আর আমি করতাম তাঁকে সাহায্য। কিন্তু সারাদিন ঠোঙা তৈরি করে যা পেতাম তাতে ছু'বেলার খাওয়াই চলতো না ভালভাবে।

আমি বললাম—তারপর?

তারপর কি ভাবে যে বেঁচে ছিলাম তা আর কি বলবো। মাকে বের হ'তে হ'ল রাস্তায়। কোন এক কারখানায় সাবানের গায়ে মোড়ক লাগাবার কাজ পেলেন তিনি। কিন্তু ও কাজ করে যা পেতেন তাতেও সংসার চলতো না। দেনায় ডুবে গেলাম আমরা। ঘর ভাড়া বাকি পড়লো মাস চারেক। মা তখন সেই সাবান কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে ক্যানভাসারী আরম্ভ করলেন।

এই ক্যানভাসারী করবার সময় মাঝে মাঝে তিনি দু একজন লোককে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বোঝো!

এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করে থেকে ও আবার বললো—তারপর থেকেই আরম্ভ হ'ল আমার রোজগার। অভাবের চাপে আর মায়ের হুকুমে বাধ্য হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম আমি। এরপর একদিন খবর পেলাম যে, কোন এক ম্যাসেজ ক্লিনিকে নাকি গেলেই চাকরী পাওয়া যায়। নার্সের চাকুরী। শিক্ষা দীক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই সে কাজে।

মা-ই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সেখানে। দেখা করবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলে গেল চাকরী। মাইনে ঠিক হ'ল মাসে পঞ্চাশ টাকা। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম কাজ পেয়ে। কিন্তু পনের দিন যেতে না যেতেই বুঝে ফেললাম সেই চাকরীর গোপন কথা।

আরও বুঝলাম যে, অন্য ক্লিনিকে গেলে বেশি মাইনে ও বেশি সুযোগ পাওয়া যায়। তাই করলাম। তারপর একদিন সেখানকার আর এক নার্সের কাছ থেকে এই পাড়ার খবর পেলাম।

এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেল ও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মা?

—মা তখন আমার কাছ থেকে সরে গেছেন। যে কোম্পানিতে উনি ক্যানভাসারী করতেন তার প্রৌঢ় মালিক তাঁকে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার ছিল না আমার। তবুও বললাম—এ ভাবে জীবন যাপন করতে মন চায় তোমার?

যমুনা বললো—না চাইলেই বা উপায় কি ঠাকুরপো?

সে রাত্রিটা ওখানেই কাটালাম।

আমার জীবনের সে এক নূতন অভিজ্ঞতা।

পরদিন ভোরে উঠে মনে হ'ল আমার সারা দেহ কলঙ্কিত হয়ে গেছে। অধঃপতনের যেটুকু বাকী ছিল তাও শেষ হয়ে গেল আমার।

॥ এগার ॥

এর পরবর্তী ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা কথা বললেই সব কিছু বুঝে নিতে পারবেন আপনারা। আমি তখন প্রত্যহ হাজিরা দিচ্ছি যমুনার ঘরে। কোন কোন দিন রাত্রিবাসও চলছে। স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা বলি—"আজ অফিসেই শুয়ে ছিলাম", "আজ এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল"—এবং অনুরূপ আরও নানারকম বানানো কথা।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, লেনেকা তখন ফিরে এসেছে আবার। দৈহিক ব্যবধান ঘুচে গেছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু ব্যবধান রচিত হয়েছে মনে।

ক্রমে অফিসে রাত কাটানো এবং 'বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে যাওয়া' বিশেষ ভাবেই বেড়ে যেতে লাগলো। আমি তখন যমুনায় ডুবে গেছি। বাড়িতে কি হতো না হতো তার কোন খবরই রাখতাম না বা রাখবার দরকার বোধ করতাম না।

ফলে স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'তে লাগলো। বলাবাহুল্য পুরুষ বন্ধুর সংখ্যাই বেশি।

এইভাবেই চলছিল।

মাসের মধ্যে বোধ হয় চব্বিশ দিনেরও বেশি যমুনার ওখানেই থাকতাম আমি। যে দুচার দিন বাড়িতে থাকতাম লেনেকাকে আদর করতে চেষ্টা করতাম সাধ্যমত।

এই সময় একদিন এক চরম দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল গড়ের মাঠের এক নির্জন প্রান্তে।

যমুনাকে পাশে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলেছিলাম গঙ্গার ধার দিয়ে, হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আর একখানা ট্যাক্সি এসে আমার ট্যাক্সির একেবারে গা ঘেঁষে চলে গেল। সেই ট্যাক্সিতে দেখলাম লেনেকাকে। লেনেকার পাশে তার কাঁধে হাত দিয়ে বসেছিল মিস্টার রয়—লেনেকার একজন বন্ধু।

আমি আর লেনেকা দুজনেই দেখলাম দুজনকে আর দুজনের সঙ্গীকে।

'সিচুয়েশন' রীতিমত 'সিরিয়াস্'।

মনে মনে 'ফায়ার' হয়ে গেলাম আমি।

তারপর সময় হয়ে এলো দুজনের মধ্যে বোঝাপড়ার। "আমার গরম মেজাজ এবং লেনেকার ততোধিক গরম মেজাজ ঠোকাঠুকি হলে খুনোখুনি না হয়!" এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম আমি।

কিন্তু হ'ল না কিছুই।

দুজনেই আমরা দুজনার কাছে ধরা পড়ে গেছি তখন।

দুজনাই যেন চোর।

কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অবস্থাটা কল্পনা করে নিতে পারেন ইচ্ছামত।

অতঃপর ঘটনা চক্রের দ্রুত পরিবর্তন।

শ্রীমতী লেনেকা চিত্রাবতরণ করলেন "মধুমতী" ছদ্মনামে।

প্রথম ছবিতেই বাজার মাৎ করে দিলেন তিনি।

এরপর শ্রীমতীর যশ আর আমার অপযশ সমান তালে বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

কয়েক মাসের মধ্যেই আমি আর আমি থাকলাম না। আমি তখন হয়ে উঠলাম চিত্রতারকা মধুমতী দেবীর স্বামী।

লেনেকাকে অনেক করে বললাম—"ও লাইন ছেড়ে দাও!"

কিন্তু ও তখন 'পাবলিক এ্যাপ্রিসিয়েসন'এর নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে, আমার মত 'ইণ্ডিভিজ্য়েল'-এর কথা শুনবে কেন?

সটান শুনিয়ে দিল—"তুমি স্বামী হলেও আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার তোমার নেই।"

আমি তখন "হায় স্বামী, তোমার দিন গিয়াছে" বুঝতে পেরে স্ত্রী এবং চাকরী তুটোই পরিত্যাগ করে 'মার ডুব'।

কিন্তু ডাঙার জীব ডুব মেরে কতক্ষণ থাকতে পারে?

আমিও তাই ভেসে উঠলাম "যমুনাকা তীরে"।

সাংবাদিক সত্যব্রত, সাহিত্যিক সত্যব্রত, হয়ে গেল যমুনার 'প্যারামার'। এর পরের কাহিনী আর বলতে চাইনে, কারণ বলবার মত কাহিনী তা নয়।

আমার কথা কিছুদিনের মতো ধামাচাপা দিয়ে লেনেকা ওরফে মধুমতীর কথাই বলা যাক।

মধুমতী প্রথম ছবিতেই একেবারে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হন রূপালী পর্দার বুকে। দৈবক্রমেই হোক আর 'ট্যালেণ্ট'-এর

গুণেই হোক, প্রথম ছবিতেই নাম ছড়িয়ে পড়লো তার। এর পর থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল মধুমতীর বিজয়াভিযান। 'রত্নাবলী' চিত্রে প্রথম চিত্রাবতরণ করবার পর মাত্র ন' মাসে উনিশখানা ছবিতে অভিনয় করলো সে। বাজারে তখন "মধুমতী" ছাড়া কথা নেই। বোম্বের মধুবালাকেও বুঝি বা হার মানায় বাংলার মধুমতী।

দারুণ দারুণ পরিচিতি বের হ'তে লাগলো তার সিনেমা পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায়। আর্ট প্লেট ছাপা হ'তে লাগলো নানা ভঙ্গির।

এক সিনেমা পত্রিকায় মধুমতীর সচিত্র জীবনী বের হ'ল। তাতে লেখা হ'ল যে, মধুমতী এখনও কুমারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট সে।

আর এক পত্রিকা আবার তার ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৈনন্দিন কাজকর্মের ফটোচিত্র বের করলো। "ঘুম ভাঙবার আগে" "খাটে শোয়া অবস্থায়", "টুথব্রাস নিয়ে দন্তধাবনরতা", "ব্রেকফাস্ট টেবিলে", "সংবাদপত্র পাঠরতা অবস্থায়", "স্নানান্তে প্রসাধন করতে করতে", এবং শেষ "স্টুডিওর পথে গাড়ীর দরজায় পা দেওয়া অবস্থায়"।

ঐ সব ছবি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে কর্তিত হয়ে স্থান লাভ করলো স্কুলের ছেলের বইয়ের ভিতরে, কলেজের ছেলের বুকের পকেটে এবং পানবিড়ির দোকানের দেয়ালে।

দৈনিকের সিনেমা পৃষ্ঠায়, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, পোস্টারে, বিস্কুট কোম্পানির বিজ্ঞাপনে, সাবানের হোর্ডিং-এ, জুতো কোম্পানির ক্যালেণ্ডারে—সর্বত্রই তখন মধুমতী।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কুমারী মধুমতী তখন

দক্ষিণ কলকাতায় আলাদা বাড়ি নিয়ে বাস করছেন। শুনতে পেতাম তার মাসিক আয় দশ হাজার টাকারও বেশি।

এদিকে আমি তখন যমুনাকে রামবাগান থেকে উদ্ধার করে শ্যামবাজারে নিয়ে এসেছি। ভদ্রপল্লীতে ফ্লাট ভাড়া করে বেশ ভদ্রভাবে অভদ্র-জীবন যাপন করছি তাকে নিয়ে। কিন্তু বিপদ এসেছে অন্যদিক দিয়ে। টাকার টান ধরেছে তখন। চাকরী নেই, বই লিখলেও প্রকাশক পাই না, মোট কথা টাকার অভাবে তখন যমুনার প্রেম-যমুনার জলও বিস্বাদ লেগে উঠেছে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে তিন মাস। বাড়িওয়ালার দরোয়ান রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করেছে প্রতি সপ্তাহে দু'বার করে এসে।

টাকা রোজগারের কোন পথ দেখতে না পেয়ে আমি তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার করতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধারও কেউ দিতে চায় না।

আমার যখন এই রকম অবস্থা, ওদিকে দেশের অবস্থা তখন বদলে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি হয়েছে; "জনযুদ্ধ" "স্বাধীনতা" হয়েছে, এবং আরও অনেক কিছু হ'য়ে গেছে।

বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্যের বাজারে তখন ভাটার টান আরম্ভ হয়েছে। লড়ুয়ে সাহিত্যিকদের (Wartime writers) বই আর কেউ নিতে

চায় না তখন। তাছাড়া সাহিত্যের বাজারও তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল উঠে পড়ে লেগে গেছেন নয়া সাহিত্যের গোড়াপত্তন করতে আর একদল আঁকড়ে ধরে আছেন সনাতন আর্ট'-এর পথ।

আমার অবস্থা তখন রীতিমত সঙ্গীন। নয়া এবং পুরোণো—প্রগতি এবং সনাতন, কোন দলেই আমার স্থান নেই।

এদিকে কিছু টাকা আমার তখুনি চাই। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে গিয়ে আমার পৈত্রিক বাড়িঘর ও জমিজমা-গুলো বিক্রি করে আসবো ঠিক-করলাম।

কিন্তু হায়! সেখানে গিয়ে যে দাম পেলাম বাড়ি আর জমি-জমার, তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। বিশ হাজার টাকার সম্পত্তির দাম পেলাম মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

শুধু তাই নয়। ঐ পাঁচ হাজার টাকা থেকেও পাঁচ'শ টাকা গচ্ছা দিতে হ'ল, টাকাগুলো কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে।

কলকাতায় ফিরে এসে চারদিকের ধার দেনা মিটাতেই বেরিয়ে গেল হাজার দুয়েক। কিন্তু তখনো আমার হাতে আড়াই হাজার টাকা। ঐ টাকা নিয়েই যমুনায় সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলাম আবার পূর্ণোদ্যমে।

॥ বার ॥

আরও বছর খানেক পরের কথা।

মধুমতী তখন 'কাট্'! ভূতপূর্ব স্বামীকে বাতিল করবার যে অভূতপূর্ব পন্থাটি চিত্রজগতে চালু, মধুমতীও সেই পন্থাই গ্রহণ করলেন।

শ্রীমতী লেনেকা ওরফে মধুমতী পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমাকে এক পত্রাঘাত করলেন এই বলে যে, তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য তিনি দয়া করে এ কথাও জানালেন যে, তাঁর স্বামী (অর্থাৎ এই অধম) ইচ্ছা করলে ধর্মান্তর গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে ধর্মাচরণ করতে পারেন।

আমার কিন্তু তাঁর সঙ্গে ধর্মাচরণ করতে মোটেই ইচ্ছা হ'ল না। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে, আমার মত অধার্মিক ব্যক্তির ধর্মান্তর গ্রহণ করবার একেবারেই বাসনা নেই, অতএব...

এর পরবর্তী ঘটনা আমি যা জানি পাঠক পাঠিকারা বোধ হয় তার চেয়ে বেশিই জানেন। চিত্রতারকা মধুমতী দেবীর পুনরায় শুদ্ধি হওয়া থেকে শুরু করে আরও বহু কিছু খবর সিনেমা-পত্রিকা সমূহে ও দৈনিকের সিনেমা পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে শুনেছি।

শুনেছি বলছি এইজন্য যে, শ্রীমতীর ধর্মান্তর গ্রহণ করবার পর থেকেই আমি আর সিনেমা সংক্রান্ত কোন পত্র-পত্রিকা পড়তাম না।

আসল আকাশের মন্দাকিনীর মতই চিত্রাকাশের মধুমতী তখন রীতিমত নাম করে ফেলেছে। সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে এক নামকরা পোষাকের দোকানের 'শো-কেস'এ এক নারী মূর্তির গায়ে এক অদ্ভুত ডিজাইনের ব্লাউজ দেখলাম। ব্লাউজটির নামকরণ হয়েছে "মধুমতী ব্লাউজ"। নারী মূর্তিটির সু-উন্নত বক্ষের ইঞ্চি তিনেক নীচেই শেষ হয়ে গেছে ব্লাউজের সীমান্তরেখা।

ব্লাউজটি দেখে বড়ই পুলকিত হলাম।

বর্তমানে 'কেউ না' হলেও অতীতে যে এই মধুমতীই 'কেউ' ছিল আমার এই কথাটা সেদিন কেন যেন মনে এসে গিয়েছিল। একদা এই মধুমতী ওরফে লেনেকা কী ভালই না বাসতো আমাকে!

হায় রে অতীত! আবার যদি ফিরে পেতাম অতীতের সেই দিনগুলি!

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল আমার বুকের ভিতর থেকে।

আমি তখন যমুনায় ডুবে আছি। রামবাগানের পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করে এনেছিলাম, সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি।

লোকে জানতো আমরা স্বামী-স্ত্রী।

যমুনাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে আমারও ইচ্ছা ছিল, তাই একদিন তাকে বলেছিলাম—"চলো না, তোমাকে বিয়ে করে নিই রেজিস্ট্রি করে!"

উত্তরে ও বলেছিল—কি হবে লোক দেখানো অনুষ্ঠান করে?

বিয়ে করে তো তুমিও দেখলে আর আমিও দেখলাম। আজ তোমার বউই বা কোথায় আর আমার স্বামীই বা কোথায় ?

সত্যিই !

লাগসই জবাব দিয়েছিল যমুনা। আমার বউই বা কোথায় আর ওর স্বামীই বা কোথায় ? চমৎকার !

বিয়ে করা আর হয়ে উঠলো না শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু বিয়ে না করলেও স্বামীর কর্তব্য সবই পালন করতে হতো আমাকে। অর্থাৎ ঘর ভাড়া, জামা কাপড় কেনা এবং সংসারের আরও দু'হাজার রকমের দায় দাবী, সবই সামাল করতে হ'ত আমাকে।

বাড়ি বিক্রির টাকা শেষ হয়ে গেছে বসে বসে খেয়ে। আর চলে না। বই লেখাও বন্ধ, কারণ কোন প্রকাশকই আর চায় না আমার বই। ভাবিত হয়ে উঠলাম।

পাণ্ডুলিপি বগলদাবা করে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘোরা-ঘুরি শুরু করলাম কিন্তু কেউই আমল দিল না। ওদেরই বা দোষ কি বলুন ? বাংলা দেশটা তখন ভাগাভাগি হয়ে আমাদের ভাগে যেটুকু মিলেছে তাতে তার পক্ষে অগণিত বাঙালী সাহিত্যিকের কলমের খোঁচা সহ্য করা সম্ভব নয়। প্রকাশকেরা তাই বেছে বেছে নামকরা লেখক লেখিকার বই-ই শুধু ছাপছেন তখন।

তাই সাহিত্যের ওপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে টাকা রোজগারের অন্যতর সহজ পথের সন্ধান করতে আরম্ভ করলাম।

সহজে টাকা রোজগারের পথের নিশানাও পেয়ে গেলাম সহজেই।

পথটার নাম বললে অনেকেই চিনে ফেলবেন সেটাকে। পথটির নাম "ক্রাইম এভিনিউ"!

এ পথের যারা পথিক তাদের নাম 'ক্রিমিন্যালস্'।

আমিও এই পথেরই পথিক হয়ে পড়লাম কয়েকদিনের মধ্যেই।

এ পথে এসে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যে, বন্ধুবান্ধব এ পথে খুব তাড়াতাড়ি জোটে। আমারও তাই দেরী হ'ল না বন্ধুবান্ধব পেতে। বিপদে আপদে দু' দশটাকা ধারও জুটতে লাগলো ঐ সব বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে।

একদিন এক বন্ধু আমার বাড়িতে এসে কথায় কথায় বললো যে, আমি নাকি ইচ্ছে করলেই মাসে চার পাঁচ'শ টাকা 'ইজী-লি' রোজগার করতে পারি!

"—কি করে?" জিজ্ঞাসা করতেই বন্ধু বললো—"কতো রকম উপায় আছে, কোনটা বলবো? চলো না, কালই একটা কাজ করা যাক!"

—আমাকে কি করতে হবে?

—বিশেষ কিছুই নয়। তুমি যেয়ে একটা ফার্ণিচারের দোকান থেকে হাজার খানেক টাকার খাট চেয়ার টেবিল ভাড়া করে নিয়ে আসবে শুধু।

—তারপর?

—তারপর খদ্দের ডেকে সেগুলোকে ফাঁক করে দিয়ে এখান থেকে হাওয়া।

—ওরে বাপরে! সে আমার দ্বারা হবে না। এখানে আমাকে সবাই চেনে। হাওয়া হলেও আমার নাম ওরা জানতে পারবে একটু খোঁজ করলেই।

—বেশ, তাহলে অন্য ঠিকানাতেই তোলা হবে মালগুলো। তাহলেই তো হবে?

আমি বললাম—তা তো হবে বুঝলাম, কিন্তু ওরা দেবে কেন মাল?

—সে ব্যবস্থা আমি করবো। ওরা যদি জামীন চায় তাহলে তুমি বলে দিও যে, অমুক ব্যাঙ্কে তোমার টাকা জমা আছে, সেই ব্যাঙ্ককে জামীন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাঙ্ক জামীন হবে শুনলে ওরা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

—কিন্তু ব্যাঙ্ক জামীন হবে কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বন্ধু বললো—সে জন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু যা বললাম সেইভাবে কাজ করবে, বুঝলে?

এরপর যে ভাবে এক ফার্ণিচারের দোকান থেকে মাল বের করে এনে বিক্রি করেছিলাম সে কথা ভাবলে আজও আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। দোকানদারকে ব্যাঙ্ক-জামীনের কথা বললে সে বললো যে, সে নিজে যেতে চায় ব্যাঙ্কে।

আমি এসে বন্ধুকে সে কথা বলতেই সে অম্লান বদনে বলে দিল—বেশ। কাল বেলা ঠিক একটার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আমি ওখানে থাকবো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন কম্পিত বক্ষে আমি সেই দোকানদারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে যেতেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। সে তখন রীতিমত সাহেব। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললো—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জ্জী? টাকা তুলতে এসেছেন নাকি?

আমি বললাম—না। এঁর দোকান থেকে কিছু ফার্ণিচার ভাড়া করেছি, তাই ব্যাঙ্ক-সিকিউরিটি করিয়ে দিতে চাই।

বন্ধুটি বললো—বেশ! আপনারা একটু ওয়েট করুন। আমার হাতে কতকগুলো জরুরী কাজ আছে। কাজগুলো সেরে নিয়েই আমি ডাকছি আপনাদের।

এই কথা বলেই সে চালের সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের ভিতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একটি চাপরাসী এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল সেই ঘরে।

বন্ধুটিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। সে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের চেয়ারে।

আমাকে দেখেই বন্ধুটি বললো—হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন তো!

আমি বললাম—হাজার খানেক টাকার একটা লেটার অফ-গ্যারান্টি দিতে হবে আমায়। আমি এঁদের দোকান থেকে এক হাজার টাকার মতো ফার্ণিচার ভাড়া করেছি, তার জন্য জামীন চাইছেন এঁরা।

দোকানদার লোকটি হেঁ হেঁ করে হেসে বললো—মানে বোঝেনই তো, আমরা হলেম গিয়ে···

বন্ধুটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো—বেশ! পাবেন আপনি লেটার অব গ্যারান্টি। কিন্তু তার আগে আমাদেরও কিছু লেখাপড়া করিয়ে নিতে হবে এঁকে দিয়ে।

এই বলে আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো সে—আপনি একখানা দরখাস্ত লিখে নিন ব্যাঙ্কের নামে। লিখুন যে যতদিন দোকান থেকে রিলীজ লেটার না পাওয়া যাবে ততদিন আপনি আপনার স্থায়ী আমানতের টাকা তুলতে পারবেন না ব্যাঙ্ক থেকে।

আমি বললাম—বেশ। দিন একখানা কাগজ। আমি লিখে দিচ্ছি।

বন্ধুটি তখন একখানা প্যাড্ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—লিখুন।

দরখাস্ত লেখা হয়ে গেল। বন্ধুটি সেখানা পড়ে দেখে বললো—ঠিক আছে। আজ আপনি যান। কাল চিঠি টাইপ হয়ে পিওন বুক করে এঁদের দোকানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কেমন?

দোকানদার খুশি মনেই ফিরে এলো ব্যাঙ্ক থেকে।

পরদিন বেলা প্রায় একটার সময় বন্ধুবর এসে খবর দিল যে চিঠি চলে গেছে—এবারে মালগুলো নিয়ে এসো।

আমি বললাম—কি করে করলে এসব?

বন্ধুটি হেসে বললো—এসব ব্যাপার জানতে হলে আরও অনেকদিন এ লাইনে ঘুরতে হবে ব্রাদার। ব্যাপার কি করেছি জানো? কাল বেলা বারটার সময় ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম যে, একটা লাখ টাকার পার্টি এনে দিলে আমাকে কি কমিশন দেবে। লাখ টাকার পার্টি শুনে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো একেবারেই বেসামাল। আমি তখন তাকে বললাম যে এসব পার্টিকে ট্যাক্‌ল্ করা তার মতো লোকের কর্ম নয়। সে যদি ঘণ্টা খানেকের জন্য আমাকে তার চেম্বারে বসতে দেয় তাহলেই কাজ ফতে করতে পারি আমি।

হাঁদারাম তাতেই রাজী হয়ে গেল। এর পর তোমরা যখন গেলে তখন আমি সহজেই তোমাদের ডেকে নিয়ে গেলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—কিন্তু লেটার অব-গ্যারাণ্টি?

—ওটা একটা ম্যানিপুলেশন। ব্যাঙ্ক থেকে আসবার আগে কয়েকখানা 'লেটার হেড' ছিঁড়ে পকেটস্থ করে নিয়ে আসি। বাইরে

এসে ও থেকেই একখানা টাইপ করিয়ে একটি পিওনকে কিছু পয়সা কব্‌লে পাঠিয়ে দিয়েছি দোকানে।

জোচ্চুরীর এই অভিনব পন্থা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো আমার বন্ধুটির প্রতি। মনে মনে গুরু বলে মেনে নিলাম তাকে।

তারপর বুঝতেই পারেন বেচারা ফার্নিচারওয়ালার অবস্থা। মালগুলো নিয়ে এসে একটা বড় বাড়ির নীচে ফুটপাতে ডেলিভারী নিয়ে ঠেলাওয়ালাকে মোটা বকশিস দিয়ে বিদায় দেওয়া হ'ল। একটু পরেই অন্য একজন ঠেলাওয়ালা ডেকে মালগুলো নিয়ে যাওয়া হ'ল ক্রেতার দোকানে। হাজার টাকার মাল নগদ পাঁচ'শ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হ'ল ঐ দিনই। আমার ভাগে জুটলো 'ফিফ্‌টি পারসেণ্ট' অর্থাৎ আড়াই'শ টাকা। ক্রাইমের পথে সেই আমার প্রথম রোজগার।

॥ তের ॥

এর পর থেকেই শুরু হয়ে গেল আমার অপরাধ জগতে আনা-গোনা।

গুরুর কৃপায় অচিরেই পোক্ত হয়ে উঠলাম। নানা দিকে মাথা খেলছে তখন।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল যে, বইয়ের বাজার থেকেও ইচ্ছা করলেই মোটা টাকা রোজগার করা যায়। গুরুদেবকে বললাম—এসো গুরুদেব, একটা নূতন 'বিজনেস্' করা যাক্!

—বিজনেস! তার মানে দু'মাস ছ'মাস হা-পিত্যেস করে বসে থাকা! না ব্রাদার, ও সব বিজনেস্ ফিজনেস্ আমার দ্বারা হবে না।

আমি বললাম—আরে না না, এ বিজনেস্ সে বিজনেস্ নয়; এ হচ্ছে বই 'কাউণ্টারফিট'-এর কারবার।

—বই কাউণ্টারফিট! সে আবার কি হে? 'আই, পি, সি'তে তো 'কাউণ্টারফিটিং কয়েন'-ই শুধু আছে।

আমি হেসে বলাম—হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার নয়া আবিষ্কার।

গুরুদেব বললো—বলো তো শুনি তোমার নয়া পরিকল্পনাটা?

আমি তখন ব্যখ্যা করে বুঝিয়ে দিলাম তাকে যে, বাংলা সাহিত্যে যে সব বইয়ের কাটতি খুব বেশি সেই বইগুলোর 'ডুপ্লিকেট এডিশন' ছেপে বাজারে ছাড়লে মোটা লাভ। বিষয়টা খুলেই বলছি।

মনে করুন শরৎ চন্দ্রের বইয়ের কাটতি খুব বেশি। কিন্তু ঐ বইগুলোর প্রকাশক হচ্ছেন গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স। এখন আমরা যদি কোন প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ঐ নামেই ছেপে ফেলতে পারি বইগুলো তাহলে বিক্রি করতে মোটেই অসুবিধে নেই। কলকাতার বাজারে না ছেড়ে মফস্বলে নিয়ে গিয়ে একটু বেশি কমিশন দিলেই নগদ টাকায় বিক্রি হয়ে যাবে সব বই।

গুরুদেব কিন্তু সায় দিল না ওতে। সে বললো—ওতে ভাই অনেক হ্যাঙ্গাম। কোথায় প্রেস, কোথায় দপ্তরী, অতো সব কাণ্ডকারখানা করে পোষাবে না। তার চেয়ে ভুয়ো রেল-রসিদ ছেপে পার্টি বধ করা ঢের সহজ।

অতএব সেই সহজ পথেই কাজ শুরু করা গেল।

গুরুদেবই বাত্‌লে দিলেন এ কাজের 'ইনার সিক্রেসি'। এক খেতে-না-পাওয়া প্রেস থেকে রেল রসিদ ছেপে নিতে অসুবিধে হ'ল না। এর পরেই আরম্ভ হ'ল 'রিয়েল এ্যাকশন'। কি ভাবে পার্টি বধ করা হ'ত খুলেই বলছি সে কথা। তবে বিষয়টা বলবার আগে কলকাতার ব্যবসা জগতে কিভাবে চালানী মালের কাজ কারবার হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

ব্যবসা জগতের খোঁজ খবর যাঁরা সামান্য কিছুও রাখেন, তাঁরা সবাই জানেন যে, মফঃস্বল থেকে যে সব মাল (commodity or merchandise) কলকাতায় আসে, তার বেশির ভাগই আসে রেলপথে।

মনে করুন উত্তর প্রদেশ থেকে তিন ওয়াগন সরষে এনেছেন আপনি। এই মাল আনতে হলে উত্তর প্রদেশের কোন না কোন

স্টেশন থেকে মালগুলো ওয়াগনে ভর্তি করে হাওড়ায় বুক করতে হবে আপনাকে।

এখন হাওড়ায় যার নামে বুক করা হ'ল সে যদি কোন তেলের কলে বা সরষের পাইকারের কাছে গিয়ে সেই তিন ওয়াগন সরষে অগ্রিম বিক্রি করতে চায়, তাহলে তেল কলের মালিক বা সরষের পাইকার সঙ্গে সঙ্গে কিনে নেবে তা।

দরের দিক দিয়ে মন করা সামান্য কিছু সুবিধা দিলেই তারা লুফে নেবে সেই মাল।

কিন্তু এই মালের এই অগ্রিম বিক্রিটা হবে ঐ রেল-রসিদের জোরেই। প্রকৃত পক্ষে রেল-রসিদখানাই কিনে নেবে ক্রেতা। অবশ্য দাম দেবার সময় আইন মোতাবেক 'এনডোর্স' করিয়ে নেবে সে।

এই যেখানে নিয়ম সেখানে তো রেল রসিদ হাতে থাকলেই কাজ ফতে করা যায়। গুরুদেব তখন নানা রকম বাজার চালু মালের ভুয়ো রসিদ তৈরি করে নিয়ে আমাকে দালাল সাজিয়ে হবু ক্রেতাদের কাছে পাঠাতে লাগলো।

মাস কয়েকের মধ্যেই তিন চারটে মোটা 'ট্রানজেক্‌শন' করে ফেলা গেল এই উপায়ে। টাকাও হাতে এলো হাজার দশেকের মতো। কিন্তু হায়, ভাগের বেলায় আমার ভাগ্যে জুটলো অষ্টরম্ভা। এক সুন্দর প্রভাতে গুরুদেব আমাকে কদলি প্রদর্শন করে হাওয়া হয়ে গেল।

হিসাব করে দেখলাম যে, আমার অংশে তখন বেশ কিছুটা অপরাধের বোঝা ছাড়া আর কিছু জমা হয়নি। 'এইডিং এ্যাণ্ড এ্যাবেটিং' (Aiding and abetting) এর জন্য আমি অপরাধী হয়ে রইলাম।

ফল পেতেও দেরী হ'ল না।

একদিন বড়বাজারের কাছে জনৈক ডিসিভ্‌ড্‌ (deceived) পার্টি আমাকে 'ক্যাচ্‌' করে ফেলে টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেলেন।

থানার অফিসার-ইন-চার্জ ফরিয়াদী পক্ষের বক্তব্য শুনেই গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক্‌ দিলেন—"দরওয়াজা!"

সঙ্গে সঙ্গে 'দরওয়াজা' এসে খট্‌ করে সেল্যুট করে দাঁড়ালো তাঁর সামনে।

দারোগাবাবু হৃদ্‌কম্প উদ্রেককারী কণ্ঠে হুকুম দিলেন "আসামীকো ফাটকমে বন্দ্‌ করো!"

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই 'দরওয়াজা' আমার দিকে তাকিয়ে যে অনভিধানিক শব্দটি উচ্চারণ করলো সেটি হচ্ছে—"চ্যল্‌।"

এর মিনিট কয়েক পরেই আমি যথাবিহিতরূপে থানার 'লক্‌-আপ্‌'এ স্থান লাভ করলাম।

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়ে গেল।

এরপর যে ব্যাপার আরম্ভ হ'ল তা সেই যতীন চক্রবর্তীর মামলারই পুনরাবৃত্তি। থানা থেকে কোর্ট—সেখান থেকে জেল হাজত এবং সেখান থেকে মাসে দু'বার করে কোর্টে হাজিরা দিতে দিতে মাস দুই বাদে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড।

দশমাস দশদিন পরে জেলখানার গর্ভ থেকে যেদিন মুক্তি পেলাম

সেদিন মনে হ'ল যে, ছুনিয়াটা যেন অনেকখানি বদলে গেছে ইতি-মধ্যেই। যমুনার কাছে গিয়ে দেখি সে তখন অন্যপথে বইতে শুরু করে দিয়েছে। আমার সাড়া পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি বলে দিল—"তুমি এখন যাও, বাবু দেখলে মহা অনর্থ বাধিয়ে বসবে।"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম ভদ্রপাড়ায় কি করে অন্য লোক নিয়ে ঘর করছে ও ভেবে।

যমুনা যে আমাকে তাড়িয়ে দেবে সে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি কোনদিন। কিন্তু না ভাবলেও তাই হ'ল।

যমুনা আর মধুমতী—কোন নদীতেই আর ঠাঁই নেই আমার এই জীবন তরণীর। এবার বোধ হয় গঙ্গার বুকেই আশ্রয় নিতে হবে আমাকে। হিন্দুর শেষ আশ্রয়ই হচ্ছেন গঙ্গা। মনের দুঃখে তাই সেদিন কলঙ্কিত এই দেহটিকে গঙ্গার জলেই বিসর্জন দেবো ঠিক করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম গঙ্গার দিকে।

"কুমারটুলী ঘাট"-এর পাশে যে ঢালু জায়গাটা আছে সেটা বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলাম। আর একটু এগুলেই গঙ্গা।

জলের দিকে তাকালাম আমি। ঘোলা জলরাশী তীর গতিতে ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে।

সেই জলেই নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হ'লাম আমি।

কল্পনায় ভেসে উঠলো মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ। শীতল—অন্ধকার—ভয়ঙ্কর।

জলে না নেমে বসে পড়লাম সেখানে।

মনের পর্দায় ভেসে উঠলো মরণের পরের দৃশ্যগুলি। পচে ফুলে উঠেছে আমার এই দেহটা। স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ভাটির

দিকে। হাওড়ার পুল পেরিয়ে, নোঙ্গর করা জাহাজগুলোর পাশ কাটিয়ে ভেসে চলেছে আমার দেহটা। হয়তো জল-পুলিশ তুলে নেবে। ফটো তুলে টাঙিয়ে দেবে পুলিশ অফিসের সামনে। পুলিশ গেজেটে ফটোর নীচে ছাপা হবে—"Unidentified dead body found" : সনাক্ত করতে অনুরোধ জানানো হবে জনসাধারণকে। উঃ! কী ভয়ঙ্কর।

না। এ ভাবে মরা হবে না। তাছাড়া কেনই বা মরবো? যমুনা তাড়িয়ে দিয়েছে? মধুমতী চলে গেছে? কি হয়েছে তাতে? ওরা আমার কে? কেউ নয়। কেউ ছিল না ওরা আমার কোন দিন। আমি না লেখক? আমি না বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক? তবে কেন মরতে যাবো আমি!

আমি রচনা করবো সাহিত্য। নিজের জীবনের ঘটনাগুলো নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করবো আমি। কিন্তু আমি যে জেল-ফেরৎ আসামী! লোকে আমাকে ঘৃণা করবে। সত্যিই কি ঘৃণা করবে? পাশ্চাত্ত্যের দু'একজন নামকরা লেখকও তো জেল খেটেছিলেন, কিন্তু তাতে তো তাঁদের সাহিত্যকে ঘৃণা করেনি কেউ। তাছাড়া আমার জেল খাটার কথা জানেই বা কে? ছদ্মনামে জেল খেটেছি আমি। ওতে বরং সুবিধাই হয়েছে। জীবনের একটা অন্ধকারময় দিক দেখে আসার সুযোগ হয়েছে আমার।

আমার সৃষ্ট সাহিত্যে আমি লিখবো সেই সব কথা।

তা তো লিখবো! কিন্তু এখন কি করি?

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হাতে একটা পয়সা নেই। কি খাই, কোথায় রাত কাটাই? হঠাৎ মনে পড়লো মুট্ হ্যামসুনের কথা। 'হাঙ্গার' লিখবার আগে তাঁর অবস্থাও ছিল আমার আজকের

অবস্থার মতো। অভাব যে কি, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মর্মে মর্মে। তাইতো তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন ঐ বই! ক্ষুধার তীব্র জ্বালাকে তাই না তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন ঐভাবে!

সম্পদের সুখাসনে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। তাতে হয় শুধুই লেখা—বড়লোক আর বড়লোকীর রকমারি বর্ণনা। নানা 'মেকার'-এর নানা মডেলের মোটর গাড়ির নাম আর দাম, সমাজের উপরতলার মেয়েদের কাল্পনিক বিলাস-ব্যসনের কল্পিত কাহিনী, 'লাক্সারী' আর 'টয়লেট গুডস্'-এর তালিকা, কোন শাড়ির সঙ্গে কি রঙের ব্লাউজ 'ম্যাচ্' করে, 'অর্কিড্'-এ নানারকম বিলিতি ফুলের গাছ আর সেগুলোর ইংরেজী নাম, কারণে অকারণে নামকরা পাশ্চাত্ত্য লেখকদের বই থেকে 'কোটেশন' তুলে দেওয়া, এবং তরুণ তরুণীর মুখে প্রেমের বহুবচন—এ সব দিয়ে বই লেখা চলে; বিক্রিও হয় সে সব বই, কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্য ওতে নেই, থাকতে পারে না।

কল্পনা-বিলাসী লেখকের অক্ষম ও অতৃপ্ত কামনাকে কলমের আঁচড়ে রূপ দিয়ে পৃষ্ঠা ভর্তি করলে প্রকাশক পাওয়া যায়, বহুল প্রচারিত মাসিক বা সাপ্তাহিকে ছাপাও হতে পারে তা, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার মূল্য কতটুকু?

যাই হোক, মরা শেষ পর্যন্ত হ'ল না।

প্রথমে ও ব্যাপারটাকে যত সহজ মনে করেছিলাম, মরতে গিয়ে দেখি আসলে ওটা তত সহজ তো নয়ই, বরং ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন। এতদিনে বুঝলাম যে, কেন মানুষ না খেতে পেয়ে ফুটপাতে শুকিয়ে মরে তবুও আত্মহত্যা করে না।

ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম আমি। জাহ্নবীর ঘোলা জলকে পেছনে

রেখে দ্রুতপদে ওপরে ওঠতে লাগলাম বেঁচে থাকবার আকুল আগ্রহ বুকে নিয়ে।

রাস্তায় উঠেই মনে হ'ল—"এবারে কোথায় যাই!"

এখনই আমার প্রয়োজন আহার আর আশ্রয়—প্রয়োজন টাকার।

হঠাৎ মনে পড়লো 'পদধ্বনি' আর 'বকুলবাসিনী'র কথা। 'পদধ্বনি প্রকাশালয়' নিয়েছিল আমার লেখা 'ব্যর্থ জীবন' আর 'বকুল-বাসিনি পুস্তকালয়' নিয়েছিল বিয়ের উপহারের বই 'নারী যুগে যুগে' 'টেন পারসেন্ট রয়েলটি বেসিস্'এ।

সবে তখন সন্ধ্যা হয়েছে। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে, তাই ভাবলাম হয়তো কিছু পেলেও পেতে পারি।

প্রথমেই গেলাম 'পদধ্বনি'তে।

দোকানের মালিক প্রেমহরি বাবু দোকানেই ছিলেন, তাই দেখা হয়ে গেল সহজেই।

নমস্কারান্তে জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু বিক্রি টিক্রি হয়েছে কি?

"হবে হয়তো" বলে প্রুফে মন দিলেন প্রেমহরি বাবু। ব্যস্ততা বেড়ে গেল তাঁর।

বিনীত কুণ্ঠায় আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম তাঁকে আমার উপস্থিতির কথাটা।

চশমার ফাঁক দিয়ে আমার মুখের দিকে চোখ দুটো তুলে ধরলেন তিনি। গম্ভীর ভাবে বললেন—কি বলছেন বলুন?

—আজ্ঞে আমার 'ব্যর্থ জীবন'-এর হিসেবটা?

—বললাম তো দেখা হয়নি এখনও, আপনি বরং আর একদিন আসুন।

দমে গেলাম প্রেমহরি বাবুর বচন শুনে। তবুও বললাম—বড্ড দরকার, আজ যদি কিছু দিতেন ?

—নাঃ! আপনি দেখছি নাছোড়বান্দা ; গৌরহরি !

কর্মচারি গৌরহরি খাতা লিখছিলেন। খাতা থেকে মাথা তুলে উত্তর দিলেন—কি বলছেন বড়বাবু ?

—দেখুন তো ক্যাশে টাকা আছে কি না ? থাকে তো গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে দিন এঁকে।

একটু পরেই দু'খানা কড়কড়ে দশটাকার নোট এনে আমার হাতে দিলেন গৌরহরি।

আমি তখন মনে মনে 'গৌরহরি' বলে এবং মুখে গৌরহরিকে ধন্যবাদ আর প্রেমহরিকে নমস্কার জানিয়ে পথে নেমে পড়লাম 'পদধ্বনি' থেকে।

তারপর সোজা গেলাম বকুলবাসিনী পুস্তকালয়ে। বকুলবাসিনীও নিরাশ করলেন না আমাকে। একখানা দশটাকার নোট বের করে দশ 'ইনটু' দশ 'ইজ ইকুয়েল টু হানড্রেড্ টাইম্‌স্' আমাকে শুনিয়ে দিলেন যে, 'পাবলিশিং বিজনেস'এ তাঁদের মতো 'অনেষ্ট কন্সার্ন' নাকি ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

টাকাটা দিয়ে বকুলবাসিনীর মালিক বঙ্কুবিহারী বাবু প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন—আপনার হাতে ঐ কি বলে ইয়ে···মানে ঐ 'যৌবন সায়রে'র মত লেখাটেখা আসে না সত্যবাবু ?

বললাম—নিশ্চয়ই আসে। 'যৌবন সায়রে' কেন 'প্রৌঢ় পগারে' এবং 'বৃদ্ধ ভাগাড়ে' পর্যন্ত বের করে দিতে পারি দরকার হ'লে।

বঙ্কু বাবু বললেন—'প্রৌঢ় পগারে'! তার মানে ? ও রকম বইও চলে নাকি বাজারে ? এই ব'লে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

আসল ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে তিনি বললেন—ও! আপনি ঠাট্টা করছিলেন?

আমি বললাম—না, ঠাট্টা করবো কেন? বলেন তো আজ রাত থেকেই লেগে যাই, ঐ কি বললেন—'যৌবন সায়রে' লিখতে।

বঙ্কুবাবু যে আমার কথায় খুশি হলেন তা তাঁর চা আনবার হুকুম দেওয়া শুনেই বুঝতে পারলাম।

কর্মচারিটিকে চায়ের দোকানে পাঠিয়ে বঙ্কুবাবু বললেন—বসুন না একটুখানি!

বসলাম।

আমি বসলে বঙ্কুবাবু আবার বললেন—কথাটা হচ্ছে কি সত্যবাবু, মানে···বইখানা আমি বেশ ভাল 'গেট-আপ' দিয়ে বের করতে চাই। আচ্ছা মেরী স্টোপস্ না কি নাম—তার বই-টইগুলো পড়া আছে কি আপনার?

বললাম—তা আছে।

—তাহলে লিখে ফেলুন একখানা ফর্মা পনের যোলর মতো। দাম ভালই পাবেন ঠিকমত লিখতে পারলে। তবে হ্যাঁ, একটি কথা আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি; পুলিশে না ধরে সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন; আর নামটাও যেন বেশ একটু হেঁ হেঁ গোছের হয়—এই ধরুন "পুরুষ ও প্রকৃতি" গোছের, বুঝলেন?

বুঝলাম সবই, এবং বুঝে সুঝেই রাজী হয়ে গেলাম 'পুরুষ ও প্রকৃতি' লিখতে।

গঙ্গার ধার থেকে উঠবার সময় সেই যে ভেবেছিলাম জবরদস্ত সাহিত্য সৃষ্টি করবো, বকুলবাসিনীর অর্ডার পেয়েই সে বাসনা ধামা চাপা পড়ে গেল।

ত্রিশ টাকা সম্বল করে আবার শুরু হ'ল আমার জীবনের পথে চলা।

বকুলবাসিনী থেকে বেরুতেই প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছিল। অতো রাত্রে কোন বোর্ডিংয়ে সিট পাবো কিনা, তাছাড়া সিট পেলেও বেডিং স্যুটকেশ-হীন লোককে জায়গা দেবে কিনা ভাবতে ভাবতে আর এক অভাবনীয় আশ্রয়ের কথা মনে হয়ে গেল আমার—"আজকের রাতটা কোন মেয়েমানুষের ঘরে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? বিছানাপত্রের ভাবনা ভাবতে হবে না, বাক্স স্যুটকেশ নেই বলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না—সেই ভাল।"

এক পাঁইজীর হোটেলে 'গোস্ত্ রোটি' খেয়ে নিয়ে হাঁটা দিলাম নিষিদ্ধ পল্লীর দিকে। চার টাকায় একজনের সঙ্গে দর-দস্তুর করে তার ঘরে গিয়ে হাজির হ'লাম।

গদীর ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে মনে হ'ল—"যাক্ বাঁচা গেল! আজকের রাতটার মতো আশ্রয় তো পেলাম, কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে।"

গা থেকে জামাটা খুলে দড়ির ওপর রেখে দিয়ে বিছানার ওপরে গদীয়ান হয়ে বসে বনেদী চালে হুকুম করলাম—কিছু কাগজ আনিয়ে দিতে পারো?

—কাগজ!

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো মেয়েটি।

আমি বললাম—হ্যাঁ কাগজ! লিখবো। আমি বই লিখি কি না!

আমি যে লেখক সে কথাটা ওকে জানাবার দুর্বলতা দমন করতে পারলাম না।

মেয়েটি জানালো যে, কাগজ তাদের পাড়ায় সহজলভ্য নয়, তবে ইচ্ছে করলে বড় রাস্তা থেকে আনিয়ে নিতে পারা যায় ঝিকে কিছু বকসিস্ দিয়ে।

তাতেই রাজী হয়ে গেলাম।

ডাকা হ'ল ঝিকে।

ঝি কিন্তু কাগজের ফরমায়েস শুনে দুই চোখ কপালে তুলে তাকালো আমার দিকে। যাই হোক, অবশেষে দু' আনা বকসিস্ কব্‌লে চার আনা দামের একখানা খাতা ছ'আনায় কিনিয়ে আনানো গেল তাকে দিয়ে।

ফাউন্টেনপেন পকেটেই ছিল। আমি তখন আর কালবিলম্ব না করে লেখা শুরু করে দিলাম 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র পাণ্ডুলিপি।

কি লিখেছিলাম তা না বললেও চলে, কারণ সে বই এখনো বাজারে চলছে। নগদ তিনটি টাকা ব্যয় করলে যে কেউ কিনে পড়তে পারেন সে বই; যদিও মলাটের ওপরে ছাপা আছে—"কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য"।

ঘণ্টাখানেক লিখবার পর মেয়েছেলেটি বললো—কি লিখছেন? গল্প?

বললাম—হ্যাঁ।

—আমাদের রানীদি'র কথা লিখুন না? অদ্ভুত আব্দার করে বসলো সে।

—রানীদি'!. রানীদি'টি কে?

—আমার পাশের ঘরেই রানীদি' থাকতো।

—থাকতো মানে? এখন নেই নাকি?

—না। সে মারা গেছে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরেছে সে।

"কী সর্বনাশ! পুড়ে মরেছে? স্বেচ্ছায়? বলে কি এ!"

জিজ্ঞাসা করলাম—মারা গেল কেন?

মেয়েছেলেটি বললো—সে এক কাহিনী। একদিন একটা ছেলে আসে রানীদি'র ঘরে। ছেলেটাকে আমিও দেখেছিলাম। বয়স বোধ হয় আঠার উনিশ হবে। ছেলেটি চলে যাবার পরেই রানীদি'র ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। আমি যেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে? উত্তরে রানীদি' বলে যে, কিছুক্ষণ আগে যে ছেলেটি তার ঘরে এসেছিল সে নাকি তারই ছেলে। সে কাঁদছিল আর বলছিল—"হায় ভগবান, শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলেই এলো আমার ঘরে।"

আমি বললাম—তারপর?

—তারপর শেষ রাত্রের দিকে রানীদি'র ঘরে আগুন দেখে আমি চিৎকার করে উঠি। আমার চিৎকারে বাড়ির অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। আমিও যাই তাদের সঙ্গে। দেখি, রানীদি'র তখন শেষ অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে রানীদি'কে হাসপাতাল পাঠিয়ে দেয় এ্যাম্বুলেন্স ডেকে। কিন্তু হাসপাতাল যাবার পথেই মারা যায় রানীদি'।

আমি বললাম—তার সম্বন্ধে যা জানো আমাকে বলবে?

আমার অনুরোধে মেয়েটি রানীর সম্বন্ধে যে কাহিনী বলেছিল তার মোটামুটি বিবরণ এই:

"বাংলা দেশের শত শত হতভাগিনী নারীর মধ্যে রানীও একজন। খুব ছেলেবেলাতেই তার বাপ মা মারা যায়। তারপর সে মানুষ হ'তে থাকে মামার বাড়িতে। তার মামার অবস্থা খুব ভাল না হলেও মোটামুটি মন্দ ছিল না। কিন্তু অবস্থা খারাপ না হ'লেও মা

বাপ মরা ভাগ্নীকে লেখাপড়া শেখাবার মতো মনের ঔদার্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তাই রানীকে মামার সংসারে বিনা মাইনের ঝি-গিরি খাটতে হ'ত। ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবন এলো তার দেহে। কিন্তু তার যে বিয়ে দিতে হবে সে কথা বোধ হয় তার মামার মনেই ছিল না একেবারে।

হয়তো তার বিয়ে হয়ে গেলে সংসারে কাজকর্ম করবার লোকের অভাব হবে, কিংবা তার বিয়ে হ'লে মামা-মামীর যুগ্ম-প্রচেষ্টা-সঞ্জাত উৎপন্ন দ্রব্যগুলির দায় সামলানো কঠিন হ'বে মনে করেই বিয়ের কথা তিনি মুখেও আনতেন না।

তাই বাধ্য হ'য়ে নিজের পথ নিজেকেই দেখে নিতে হয়েছিল তাকে। পাড়ায় এক যুবকের প্রেম নিবেদনের উত্তরে সাড়া দিয়ে তাকেই সে একদিন বিয়ে করে ফেলেছিল রেজিষ্ট্রী করে।

নতুন প্রেমের নেশায় এবং ঘর বাঁধবার আকুল আগ্রহে প্রথমে সে ভেবেছিল যে, একটা কাজের মতো কাজ সে করে ফেলেছে। কিন্তু কাজটা যে অ-কাজ এবং যার গলায় সে মালা দিয়েছে সে যে একজন দাগী আসামী এটা সে বুঝতে পারলো বিয়ের কিছুদিন পরেই।

বছর দুই মাত্র তার স্বামী তার সঙ্গে বাসা করে ছিল। এই দুই বৎসরে একটি পুত্র-সন্তানও উপহার দেয় সে।

ছেলের যখন ছ'মাস বয়স সেই সময় একদিন তাদের বাড়িতে পুলিশ এসে তার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। সে নাকি একটা ডাকাতী মামলার ফেরারী আসামী। অনেকদিন থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

বিচারে পাঁচ বৎসর জেলের হুকুম হয়ে যায় তার।

এদিকে রানী তখন তার সেই শিশুপুত্রকে নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে আবার মামার বাড়িতে যায় আশ্রয় ভিক্ষা করতে। কিন্তু মামা মামী তাকে ধুলো পায়েই বিদেয় করে দেয়।

এর পরের কাহিনী দীর্ঘ এবং করুণ।

নানা ঘাটের জল খেতে খেতে অবশেষে সে বাধ্য হয়ে ছেলেটিকে এক অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দেয়। ছেলের বয়স তখন চার, আর তার বয়স উনিশ।

ছেলেকে অনাথ আশ্রমে দিয়েও কিন্তু সৎপথে বেঁচে থাকবার মতো রোজগার সে করতে পারলো না। যেখানে যে কাজের জন্যই সে যেতো, সর্বত্রই কাজ দেনেওয়ালারা দাবী করে বসতো তার দেহ। অভাবের চাপে দিশেহারা হ'য়ে অবশেষে দেহ দান করতেই বাধ্য হ'ল সে। তারপর বছর দুই যেতে না যেতেই সে হয়ে উঠলো পুরোদস্তুর দেহজীবিনী।

কিন্তু দেহজীবিনী হয়েও ছেলেকে সে ভুলতে পারে নি। গোপনে গোপনে সে তাকে দেখে আসতো অনাথ আশ্রমে গিয়ে। আশ্রমের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থাও করে রানী। ষোল বৎসর বয়সে রানীর ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে। তারপর সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখে সে এক অফিসে স্টেনো-টাইপিষ্টের চাকরী পায়। চাকরী পাবার পর সে অনাথ আশ্রম ছেড়ে দিয়ে এক বোর্ডিংয়ে যেয়ে বাস করতে থাকে।

এ পর্যন্ত সব খবরই রানী রাখতো।

কিন্তু সে ছেলের খবর রাখলেও ছেলে তাকে চিনতো না।

এমনি সময় একদিন অঘটন ঘটে। সাজ-গোজ করে রানী দাঁড়িয়ে ছিল খদ্দের ধরবার আশায়। হঠাৎ একটি আঠার উনিশ

বছরের তরুণ এসে দাঁড়ায় তার সামনে। মৌন আহ্বান জানিয়ে ছেলেটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় রানী।

কিন্তু ঘরে গিয়েই সে চিনতে পারে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে সে। ছেলেটি হকচকিয়ে যায় রানীর ভাবগতিক দেখে। জিজ্ঞাসা করতে যায়—"কি হ'ল ?"

রানী তাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়।

ছেলেটি চলে যেতেই সে বিছানার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

অসহ্য দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

তার তখন মনে হয় যে, এ জীবন রাখার চেয়ে না রাখাই ভাল। সেই রাত্রিতেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে।

রানীর জীবনের এই মর্মন্তুদ কাহিনী বলবার পর মেয়েটি যেন কেমন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হ'ল না।

তাকে দেখে আমার তখন মনে হয়েছিল যে, তার জীবনেও হয়তো রানীর মতো কোন দুর্ভাগ্যের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে সে আবার কথা বললো। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে সে আমাকে বললো—যাক্‌গে, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই, কি বলেন ? আমাদের এ লাইনে রানীদি'র মতো আরও যে কত মেয়ে আছে, তার কি কোন হিসেব নিকেশ আছে !

আমার কিন্তু তখন কেবলই মনে হচ্ছিল ঐ রানীর কথা।

কী ভয়ানক ব্যাপার !

ছেলে এসেছিল মায়ের কাছে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে!

এ কাহিনী যে লিখতেই হবে আমাকে!

মেয়েটিকে বললাম—তোমার রানীদি'র কাহিনী আমি লিখবো। ছাপা হবে সে বই।

ও বললো—বই বের হ'লে আমাকে একখানা দিয়ে যাবেন, কেমন?

"আচ্ছা দেব" বলে ধাপ্পা দিলাম মেয়েটিকে।

আজ এতদিন পরে রাণীর কাহিনী লেখা হচ্ছে। হয়তো ছাপাও হবে এ বই। কিন্তু যে মেয়েটির মুখে এই কাহিনী শুনেছিলাম, তার হাতে এ বই কখনও যাবে কি না জানি না।

॥ পনের ॥

পরদিন অতি প্রত্যুষে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি আমি। রাস্তার ধারের চায়ের দোকানগুলো তখনও খোলে নি। কর্পোরেশনের কুলীরা রাস্তায় জল দিচ্ছে তখন। রাতের-বেলা-ঘুমিয়ে-থাকা-শহরের হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে যেন।

আমারও বাকি ছিল ও কাজগুলো, তাই ছুটলাম গঙ্গার দিকে।

সেদিনের গঙ্গাকে দেখে কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যায় গঙ্গার মতো ভয়ঙ্করী মনে হ'ল না।

প্রভাতের স্নিগ্ধ গঙ্গা যেন সত্যিই সন্তাপহারিণী।

গঙ্গার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম ঘাটে। অনেক মেয়ে-পুরুষ ইতিমধ্যেই স্নান করতে এসেছে। অনেকে আবার স্নান সেরে চলেও যাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে বারবনিতাও আছে দু'চারজন লক্ষ্য করলাম। আমারও ইচ্ছা হ'ল গঙ্গায় নেমে সাঁতার কেটে স্নান করতে। বহুকাল নদীতে সাঁতার কেটে স্নান করিনি! কিন্তু পরণের দ্বিতীয় কাপড় বা গামছা সঙ্গে না থাকাতে স্নান করা আর হয়ে উঠলো না।

কিছুক্ষণ পরেই উঠে পড়লাম আমি। বলা বাহুল্য 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। খাতাখানা তখন আমার পকেটের ভিতরে।

রাস্তায় এসে এক চায়ের দোকানে একটা ডিম সিদ্ধ আর এক কাপ চা খেয়ে হাঁটা দিলাম হ্যারিসন রোডের দিকে। একটা আস্তানা জোগাড় করতেই হবে আমাকে।

হ্যারিসন রোডে বহু 'বোর্ডিং হাউস'। তাই কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই জুটে গেল চমৎকার একটা 'সিঙ্গল সিটেড্ রুম', অর্থাৎ প্যাকিং কাঠের পার্টিসন দিয়ে ঘেরা বারান্দায় খানিকটা জায়গা। চার্জ শুনলাম, খাওয়া থাকা নিয়ে মাসে পঞ্চাশ টাকা।

তাতেই রাজী হয়ে গেলাম।

দশ টাকার একখানা নোট অগ্রীম জমা দিয়ে ম্যানেজারের কাছ থেকে ঘরের চাবিটা নিয়ে বের হ'লাম বিছানা আর জামাকাপড় কিনতে। পকেটে তখনও প্রায় পনের টাকা ছিল আমার।

একটা বালিশ আর একটা বিছানার চাদর কিনতেই পাঁচ টাকা 'গন ফট্'। তোষক কেনা আর হ'ল না, কারণ বাকি টাকা থেকে একটা পাঞ্জাবী, একখানা ধুতি আর একখানা গামছা কিনতেই হবে।

কেনাকাটা করতে সবই প্রায় ফুরোলো। বালিশ আর জামা-কাপড়গুলোকে জড়িয়ে বগলদাবা করে বোর্ডিংয়ে ফিরলাম বেলা প্রায় বারটার সময়।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাতা কলম নিয়ে বসলাম। বকুলবাসিনীকে শেষ করতেই হবে দিন চার পাঁচের মধ্যে।

দিন যেয়ে রাত আসে, রাত শেষে আবার আসে দিন। আমি কিন্তু দিনরাত সমানে কলম চালিয়ে যাচ্ছি "পুরুষ ও প্রকৃতি"র

ওপর। নির্দয়ভাবে আমার কলম চলছে উদ্ভিন্নযৌবনা নারী দেহের ওপর—তার প্রতি অঙ্গের বিশেষত্বকে বিশেষিত করে।

আম কাঠের ঠেবিলের ওপর খবরের কাগজের টেবিল-ক্লথ। তারই ওপরে চলে লেখা। মাঝে মাঝে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই বিড়ি টেনে। এক বাণ্ডিল মিঠে-কড়া বিড়ি, একটা দেশলাই, খান কয়েক এক্সারসাইজ খাতা আর কলম, এই হ'ল আমার লেখার উপকরণ।

পুরুষ আর নারীর সম্বন্ধের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হয় যমুনা আর লেনেকার কথা। মনটা কেঁদে ওঠে কামনায়। মনে হয় সব দোষ আমারই।

পাঁচ দিনে শেষ হয়ে যায় 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র পাণ্ডুলিপি।

খাতাগুলো মুড়ে নিয়ে বের হই বকুলবাসিনীর উদ্দেশে।

আমাকে দেখেই বঙ্কুবাবু বলেন—এনেছেন নাকি?

খাতার প্যাকেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম—তা এনেছি বৈ কি! টাকাটা কিন্তু আমার আজই চাই!

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মোড়কটা খুলে এক নং চিহ্নিত খাতাখানা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন বঙ্কুবাবু। পৃষ্ঠা কয়েক পড়েই বললেন—বেশ হয়েছে। এ বই চলবে। তা কত দিতে হবে?

আমি বললাম—কি আর দেবেন? 'ফিফ্‌টিন পারসেণ্ট এ্যাণ্ড টু হাণ্ড্রেড রূপীজ ইন্ এ্যাডভান্স।'

—না মশাই 'পারসেন্টেজ বেসিস্'-এ বই নেব না আমি। নিতে হয় তো 'কপি রাইট'ই নেবো। এর 'কপি রাইট'-এর জন্য কত চান তাই বলুন ?

আমি ভেবে চিন্তে বললাম—পাঁচশ'।

—পাঁচশ'! বলেন কি! শ' তিনেক টাকা হয়তো বলুন। এখনই শেষ করে ফেলি কারবার।

টাকার তখন আমার ভয়ানক প্রয়োজন, তাই আর বেশি দর কষাকষি না করে তিনশ'তেই রাজী হ'য়ে গেলাম। লেখাপড়া হয়ে গেল। বঙ্কুবাবু বাক্স থেকে ত্রিশ-খানা দশটাকার নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—গুণে নিন।

নোটগুলো গুণে নিয়ে বঙ্কুবিহারীবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম আমি। প্রথমেই গেলাম কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে। এক জোড়া ধোয়া ধুতি আর গোটা কয়েক সার্ট-পাঞ্জাবী কিনলাম। ভাল দেখে এক জোড়া জুতোও কিনে ফেললাম। জামাকাপড়ে ভদ্রলোক সাজতে না পারলে কেউই খাতির করে না।

জামাকাপড় কেনা হয়ে গেলে একটা সুটকেস কিনে ওগুলো তাতে ভরতি করে চললাম বৌবাজারের দিকে। বৌবাজার থেকে একটা তোষক, একটা ভাল বালিশ, তোয়ালে, আর একখানা বিছানার চাদর কিনে নিলাম।

কেনাকাটা হয়ে গেলে ওগুলোকে রিক্সায় চাপিয়ে বোর্ডিংয়ের দিকে রওনা দিলাম। যাবার পথে এক কৌটো ফাউণ্টেনপেনের কালি আর কয়েকখানা খাতাও কিনে নিলাম।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, একটা পর্দাও কিনেছিলাম দরজায় টাঙাতে।

এরপর থেকেই শুরু হ'ল সাহিত্যের পথে আমার নূতন অভিযান। অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরলাম আমি। অতীত অতীত হয়ে গেল আমার জীবন থেকে, রইলো শুধু তার স্মৃতিটুকু আমার সাহিত্য-পথের পাথেয় হয়ে।

॥ ষোল ॥

'পুরুষ ও প্রকৃতি'কে বকুলবাসিনীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবার পর প্রথমেই মনে হ'ল—"এর পর কি লিখবো ?"

ঘরে বসে অর্ডার পাবো সে রকম নাম আমার হয়নি। তবুও বাংলা দেশের বইয়ের বাজার সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা আমার ছিল সেইটুকুকে সম্বল করেই শুরু করলাম লেখা।

শিশু সাহিত্য থেকেই শুরু করবো ঠিক করলাম। হিতোপদেশ, 'ঈশপস্ ফেব্ল্', আর ঠাকুরমার মুখে শোনা গল্পগুলোকে একত্রে পাঞ্চ করে তৈরি হয়ে গেল শিশুদের জন্য এক অপরূপ গল্প সঙ্কলন।

কিন্তু শিশুসাহিত্য লিখতে গিয়ে ফ্যাশাদ বাধলো বানান নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে তখন বানানের আদ্যশ্রাদ্ধ চলছিল। রেফ্-এর দ্বিত্ব বর্জিত হবার পর 'ং'কে নিয়েও রীতিমত 'টাগ্ অব ওয়ার' চলছে। অতীতের 'বাঙ্গালা' ভোল পালটাতে পালটাতে 'বাঙ্গলা,' 'বাঙলা' হয়ে 'বাংলা'য় এসে ঠেকেছে। 'সঙ্গে' বানান 'সংগে' হয়ে গেছে ব্যাকরণের ধার না ধেরে। 'বঙ্গ' হয়ে গেছে 'বংগ। এ ব্যাপারে অনেকে 'চলন্তিকা'কেও প্রায় "অ-চলন্তিকা" পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। এমনি বানানের গুঁতো।

অনেকে আবার 'ৎ'কেও নির্বাসন দেবার ব্যবস্থা করেছেন 'ত'য়ের নীচে হস্ চিহ্ন দিয়ে।

সাধু ভাষার স্থান দখল করে নিচ্ছে কথ্য বা চলিত ভাষা। 'করিয়া' কথাটাকে কেউ লিখছেন "করে", কেউ লিখছেন "ক'রে" কেউ লিখছেন "করে", আবার কেউবা লিখছেন "কোরে" এই ভাবে। ঈ-কারান্ত 'বাড়ী' আর 'পাখী' হয়ে গেছে হ্রস্ব ইকারান্ত 'বাড়ি' আর 'পাখি'।

'এ্যাডাল্ট' সাহিত্যে যা খুশি চালানো যায় কিন্তু শিশু সাহিত্যে যদি বানানের মারপ্যাঁচ দেখানো হয় তাহলে শিশু বেচারারা বানানের গুঁতোতেই ঘায়েল হবে, তাই বাধ্য হ'য়ে ভূতপূর্ব বানান পদ্ধতিই অবলম্বন করলাম শিশু সাহিত্যে।

এর পরেই আরম্ভ করলাম ত্রি-মূখী অভিযান। অনেকটা সেই যুদ্ধের সময়কার 'জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আক্রমণ'-এর মতো। একসঙ্গে তিনখানা বইতে হাত দিয়ে ফেললাম আমি। একখানা উপন্যাস, একখানা গল্প সংকলন আর একখানা কবিতার বই।

কবিতাগুলো এ্যাইসা প্যাঁচ মেরে দুর্বোধ্য করে লিখেছিলাম যে প্রকাশিত হবার সঙ্গেই ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল কবি মহলে। প্রস্তাবনায় লিখেছিলাম—

> "বাংলার কাব্য-সাহিত্যের রক্ষণশীল দরজায়
> চোরের মতো সঙ্কিত পদক্ষেপে নয়,
> আমি এসেছি মাহুতহীন মত্ত মাতঙ্গের মতো,
> কাঁটাতারে ঘেরা নির্জন কারা-কক্ষ থেকে,
> বন্দিনী কবিতাকে উদ্ধার করতে।"

পাণ্ডুলিপি নিয়ে পরিক্রমা শুরু করলাম প্রকাশক পল্লীতে। বধও হতে লাগলো 'ফিফটিন টু ওয়ান' হিসাবে; অর্থাৎ পনের জন প্রকাশকের দরজায় ঘুরলে একজন করে জুটতে লাগলো।

আমি যখন এই ভাবে লেখা নিয়ে ব্যস্ত, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন অনেক বদলে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে সে কথা আগেই বলেছি। দেশ ভাগ হয়ে ভারত আর পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গলাবাজী শুরু করেছে—"ইয়া আজাদী ঝুঁটা হ্যায়"।

হায়দ্রাবাদে কাশিম রেজভীর নেতৃত্বে রাজাকর আন্দোলন; জুনাগড়ে প্রজা অভ্যুত্থান হওয়ায় নবাব সাহেবের পলায়ন; মীর লায়েক আলীর প্রধান মন্ত্রীত্বে হায়দ্রাবাদে ত্রাসের রাজত্ব। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার দেহ-রক্ষা; জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজীর অধিনায়কত্বে হায়দ্রাবাদে পুলিশী অভিযান, ফলে হায়দ্রাবাদের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ।

পাকিস্থানে হিন্দু নির্যাতন, ভারতে তার প্রতিক্রিয়া। দলে দলে হিন্দু নরনারী উদ্বাস্তু হয়ে ছুটে আসে ভারতের মাটিতে। মুসলমানরা ছোটে পাকিস্তানে।

এমনি বহু কাণ্ডকারখানা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে।

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি শুরু হয়েছে। দলত্যাগ, নতুন দল গঠন আর দলভাঙা পর্ব চলছে সমানে। ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে বামপন্থী দলগুলো।

বাংলা সাহিত্যের মোড়ও তখন ঘুরে গেছে। আগের দিনের ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা সামাজিক উপন্যাস আর চলে না। রাজনৈতিক সচেতনতা এসে গেছে পাঠক পাঠিকার মনে। দুনিয়াটা বিভক্ত হয়ে গেছে দুই বিপরীত-ধর্মী রাজনৈতিক মতবাদে—সোশ্যালিজম আর ক্যাপিট্যালিজম। সোশ্যালিষ্ট দুনিয়া চেষ্টা করছে বিশ্বের জনমতকে

তাদের মতবাদের দিকে টেনে আনতে আর ক্যাপিট্যালিস্টরা চেষ্টা করছে তাদের সেই প্রচেষ্টাকে প্রাণপণে বাধা দিতে।

ভারতের কমুনিষ্ট পার্টির নেতারা দেখলেন যে, ভারতের জনমতকে প্রভাবিত করতে হ'লে শুধু শ্রমিক আর কৃষকদের দলে টানলেই চলবে না; বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ব শ্রেণীকে হাত করতে না পারলে সুবিধা হবার আশা নাই। তাঁরা তখন সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জনচিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো কমুনিষ্ট প্রভাবিত এক লেখক গোষ্টি।

কেউ কেউ নাক সিটকালেন ওঁদের লেখা পড়ে। সমালোচনা করলেন প্রচারধর্মী বলে। কিন্তু মুখে যাই বলুন, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তাঁরা গণসাহিত্যের প্রভাবকে। বাংলার অনেক নামকরা সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী আর কলাকুশলী কমুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। চাহিদা বাড়তে লাগলো এই গোষ্টিভুক্ত লেখকদের লেখার।

কমুনিষ্ট পন্থী গোষ্টি ছাড়া আরও একটা গোষ্টির সৃষ্টি হ'ল সাহিত্যে। দল হিসাবে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদেরকে বলা চলে সনাতনী দল। বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ নামকরা লেখকই এই দলভুক্ত।

নামকরা সাহিত্যিকদের নাম করবার ইতিহাস পর্যালোচনা করে কিন্তু এমন কিছু পেলাম না যাতে তাঁরা নাম করতে পারেন। পাইকারি হারে গালাগালি আর বিরূপ সমালোচনাই জুটতো হালের নামকরা সাহিত্যিকদের সেকালের লেখায়।

নামকরাদের বইগুলো পড়ে মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, অশ্লীলতা জিনিসটিকে চুটিয়ে চালাতে পারলেই নাম কেনা সহজ।

যে লেখকের লেখা নিয়ে যত বেশি আলোচনা আর সমালোচনা হবে তার পক্ষে খ্যাতি কুড়ানো তত সহজ। আর এই সমালোচনা কুড়াবার সহজতম পন্থাই হচ্ছে অশ্লীল সাহিত্য সৃষ্টি করা।

আর এক শ্রেণীর লেখক নাম করেছেন তাঁদের লেখার মধ্যে নতুন প্যাঁচ ঢুকিয়ে। এঁদের মধ্যে কেউ লিখেছেন পতনোন্মুখ জমিদার বাড়ির বিবরণ। জমিদারি সভ্যতার পতন আর বণিক সভ্যতার অভ্যুত্থান নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে চট্ করে নাম কিনে ফেললেন তিনি।

আর একজন নাম কিনে ফেললেন প্রাচীনাকে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে চালিয়ে দিয়ে। সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা দু' একখানা বইও সাহিত্যের বাজারে নাম করে ফেলেছে।

যাই হোক, সাহিত্যের প্যাঁচ (সাধুভাষায় বৈশিষ্ট) আমিও কিছুটা আয়ত্ব করে নিয়েছি তখন। ইংরাজী ভাষাটা জানা ছিল তাই গল্পের প্লটের জন্য মোটেই ভাবতে হ'তো না। বিশ্ব সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে গল্পের কাঠামো চুরি করে তারই ওপর রঙ ফলিয়ে লিখে যাচ্ছিলাম আমি। অনেকেই বাহবা দিচ্ছিলেন আমার লেখা পড়ে। দু'চার জন শিক্ষিত লেখক আমার 'সিক্রেসি'টা হয়তো ধরে ফেলতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের 'সিক্রেসি'ও ঐ একই। সুতরাং বাধ্য হয়েই চেপে গেলেন তাঁরা।

এইসব কারণেই আমিও দেখতে দেখতে সাহিত্যিক বনে' গেলাম। দু' চারজন করে প্রকাশকও হানা দিতে লাগলেন আমার দরজায়।

॥ সতের ॥

হাতে আবার টাকা আসতে লাগলো।

টাকা হাতে আসতেই অতীতের দুঃখের দিনগুলির স্মৃতি ম্লান হয়ে এলো। নারী-সঙ্গলাভের অতৃপ্ত কামনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। বয়স বেড়ে গেছে তখন আমার। চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু বয়স বাড়লেও নারীসঙ্গ লাভের কামনা এতটুকুও কমেনি। এতদিন অভাবের চাপে ওটা অনেকটা ছাই-চাপা আগুনের মতো চাপা পড়েছিল, কিন্তু টাকা হাতে আসতেই আবার মনটা উড়ু উড়ু করে উঠলো।

প্রথমেই মনে পড়লো যমুনার কথা।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হাজির হ'লাম যমুনার বাড়িতে। দীর্ঘ চার বৎসর পরে আবার দেখা হ'ল যমুনার সঙ্গে।

আমাকে দেখেই যমুনা বললো—এতদিন পরে মনে পড়েছে তাহলে আমাকে ?

আমি বললাম—একি চেহারা হয়ে গেছে তোমার ?

বীভৎস দেখাচ্ছিল ওকে। মাথার সেই ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি উঠে গিয়ে সামনের দিকটা টাক পড়বার মতো হয়েছে। চোখ দুটি ঢুকে গেছে গভীর গর্তে। গালের হাড় জেগে উঠেছে উঁচু হয়ে। মুখের উপর কালো কালো দাগ। হাত দু'খানা সরু কাঠির মতো।

দেহটি শাড়ি আর জামায় ঢাকা থাকলেও বুঝতে দেরী হ'ল না যে, শাড়ি ব্লাউজের তলায় শুধু চামড়ার ছাউনি দেওয়া হাড় ক'খানাই অবশিষ্ট আছে।

আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললো যমুনা।

বললো—এখন কেবল মরবার জন্য দিন গুনছি।

—কেন, কি হয়েছে?

—দেখবে কি হয়েছে?

এই বলেই জামা খুলে ও যা দেখালো তাতে ভয়ে আর ঘৃণায় শিউরে উঠলাম আমি। ওর সর্বাঙ্গে সিফিলিসের ঘা।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে হ'ল?

—এ লাইনে যা করে হয়। এখন আর কেউ আসে না আমার কাছে।

দুঃখিত হ'লাম ওকে দেখে।

বললাম—চিকিৎসা করাচ্ছো না কেন?

ও বললো—চিকিৎসা করাবার টাকা কোথায়?

—টাকা আমি দেবো, তুমি কালই ডাক্তার দেখাও। এ রোগের ভাল ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল। কয়েকটা N. A. B. নিলেই সেরে যাবে।

ও বললো—সত্যিই সারবে ঠাকুরপো?

বললাম—হ্যাঁ সারবে।

ওখানে বসতে ঘৃণা হচ্ছিলো। পকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে ওর বিছানার ওপরে ফেলে দিয়ে বললাম—আমি আজ যাচ্ছি, কাজ আছে। তুমি ডাক্তার দেখিও কিন্তু।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম আর দেরী না করে।

রাস্তায় এসে ঘৃণায় বমি হবার উপক্রম হ'ল আমার। তাড়াতাড়ি একটা পানের দোকান থেকে একটা মিঠে পান খেয়ে একখানা রিক্সা ডেকে উঠে বসে বললাম—চালাও ধরমতলা।

বলতে ভুলে গেছি, আমি তখন হ্যারিসন রোডের বোর্ডিং ছেড়ে দিয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে একখানা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে থাকি।

বাড়িতে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম আমি। শুয়ে শুয়ে বার বারই মনে হ'তে লাগলো যমুনার কথা। ওর দেহের দগদগে ঘা গুলো যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগলো। কী ভয়ানক! কী কুৎসিত!

কোথায় গেছে ওর দেহের সেই সৌন্দর্য। আজ ওকে দেখলে ভয় করে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হয় ওর দিকে তাকালে।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল যে, আমারও তো হ'তে পারে ঐ রোগ। ও সব পল্লীতে ব্যাধিমুক্ত মেয়ে ক'জন আছে? আর থাকলেও ব্যাধিগ্রস্থ হ'তে কতক্ষণ!

ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে আমার।

লেনেকার কথা মনে হয়। কত ভাল মেয়ে ছিল ও। আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল একদিন। আজ আমার জন্যই ও আমাকে ছেড়েছে।

ওর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে শুনেছি। সে নাকি এখন নতুন এক উদীয়মানাকে বিয়ে করেছে। একবার মনে হ'ল—"ওর কাছে গেলে কেমন হয়?"

পরক্ষণেই মনে এলো ধিক্কার। আমাকে ও ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যাগ করে গেছে।

...কয়েকদিন পরে।

হঠাৎ একখানা চিঠি পেলাম যমুনার কাছ থেকে। ওর কাছ থেকে পাওয়া ঐ আমার প্রথম চিঠি। যমুনা লিখেছিল ঃ

ঠাকুরপো !

সেদিন সেই যে কুড়িটি টাকা তুমি দিয়ে গিয়েছিলে সে টাকা দেনা শোধ করতেই চলে গেছে। ডাক্তার দেখানো আর হয় নি। আজ আমার শেষ অবস্থা। বাড়িতে একটিমাত্র ঝি ছাড়া আর কেউ নেই। সেও চলে যাবে বলছে। মাইনে না পেয়ে আর ক'দিনই বা থাকবে !

আমি বোধ হয় আর ৫।৭ দিনের বেশি বাঁচবো না। মরবার আগে তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে। যদি ইচ্ছে হয় একবার এসে এই হতভাগিনীকে শেষ দেখা দেখে যেও। ইতি—

হতভাগিনী যমুনা

চিঠিখানা পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। যমুনা আজ মৃত্যু-শয্যায় ! আমাকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়েছে ! আহা বেচারা ! পিওন পাড়ায় পুকুরের ধারে যতীনের বাসায় ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার দিনটির কথা মনে পড়ে যায়। তারপর আজ পর্যন্ত কত দুঃখ কষ্টেই দিন কেটেছে ওর। হিদারাম সরকার লেনের সেই বাসার কথা। বৌবাজার ষ্ট্রীটে মাসেজ ক্লিনিকের নিচে দেখা হবার কথা। আউটরাম বুফের এক কোণে বসে ওর সঙ্গে চা খাওয়ার কথা। ওর রামবাগানের ঘরের কথা। নতুন বাড়িতে নিয়ে আসবার কথা।—এই রকম বহু-ঘটনার ছবিই ভেসে উঠতে থাকে আমার মনের পর্দায়।

ওকে বাঁচিয়ে তুলতে ইচ্ছা হ'ল। একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই বিকালবেলা যমুনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'লাম।

আমাকে দেখে ক্ষীণস্বরে ও বললো—তুমি এসেছো ?

আমি বললাম—হ্যাঁ। ডাক্তার বাবুকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমি।

ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললাম—I think it is an acute case of syphilis.

ডাক্তারবাবু বললেন—'ওয়েসারম্যান টেস্ট' করানো হয়েছে কি ?

আমি বললাম—না।

—তাহলে আন্দাজে কি ইনজেক্সন দেবো ? আমি ভাবছি আজই ব্লাডটা টেস্ট করতে পাঠানো যাক।

তাই করা হ'ল।

যমুনার দেহ থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে একটা টেস্ট টিউবে ঢেলে নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু।

রিপোর্ট পেতে তিন দিন দেরী হ'ল। রিপোর্ট হ'ল—"strongly positive."

N. A. B ইনজেক্সন শুরু হ'ল যমুনার দেহে।

যমুনা বললো—আর কেন এসব করছো ঠাকুরপো ? আমি এবার গেলেই ভাল হয়।

আমি বললাম—তোমাকে আমি এভাবে মরতে দেব না।

ইনজেক্সনের গুণে কয়েকদিনের মধ্যেই ঘা শুকিয়ে এলো ওর। 'কোর্স' শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন—এবারে একটা টনিক দিচ্ছি। রুগীকে 'রেস্ট' দিন। খাওয়া দাওয়াটা একটু ভাল করে দিন। দেখবেন এক মাসের মধ্যেই আবার নতুন মানুষ হয়ে গেছেন উনি।

হ'লও তাই।

এক মাসের মধ্যেই যমুনা সম্পূর্ণ সেরে উঠলো। ওর দেহের সেই বিশ্রী ক্ষতগুলো আর নেই।

বিশ্রাম আর পুষ্টিকর খাদ্যের কল্যাণে শরীরটাও বেশ সেরে উঠেছে ওর।

একদিন বললাম—চলো বৌদি, তোমাকে নিয়ে পুরী থেকে ঘুরে আসি কিছুদিন। সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সেরে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি।

যমুনা বললো—এই তো বেশ সেরে উঠেছি! আবার কেন অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ করবে আমার জন্য?

আমি বললাম—সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যাবে কি না বলো?

ও বললো—কবে তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি ঠাকুরপো?

আমি বললাম—হয়েছিলে একদিন। জেল থেকে ফিরে তোমার কাছে যেদিন এসেছিলাম সেদিন তুমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে আমাকে। মনে আছে?

—আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমাকে! এই কথা বললে তুমি! তুমি যদি জানতে যে, কি কষ্টে আমার দিন চলেছিল তুমি চলে গেলে! চার মাস বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল। দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বাঁধা পড়েছিল। সেই সময় বাধ্য হয়ে আমি একজন লোকের কাছে বাঁধা হয়ে থাকি। তুমি যেদিন এসেছিলে সেদিনও সেই লোকটা ঘরে ছিল। পাছে কোন গোলমালের সৃষ্টি হয় সেই জন্য তোমাকে আমি ও কথা বলেছিলাম, কিন্তু তুমি সেই যে ডুব দিলে আর এলে চার বৎসর বাদে। আমার অবস্থার কথাটা একবার চিন্তা করে

সত্যিই তো !

ঐ অবস্থায় আর কী-ইবা করতে পারতো ও !

অনুতপ্ত কণ্ঠে আমি বললাম—আমি সেদিন তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বৌদি ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো ।

যমুনা বললো—ও কি কথা ঠাকুরপো ! তোমাকে ক্ষমা করবো আমি ! তুমি না থাকলে যে আজ আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম ! আমার জন্য তোমার উঁচু মুখ কত নীচু হয়ে গেছে, আমারই জন্য তোমার বউ ঘর ছাড়া হয়েছে—সবই আমি জানি ঠাকুরপো ।

আমি তখন ওর কাছে বসে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে বললাম—ও সব কথা থাক বৌদি ?

এই বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম—তাহলে পুরী যাওয়া ঠিক তো ?

যমুনা হেসে বলল—ঠিক বৈ কি ?

আমি তখন জিজ্ঞাসা বরলাম—আচ্ছা বৌদি, তোমার দাগগুলো সব মিলিয়ে গেছে কি ?

ও বললো—গেছে ।

—কৈ দেখি !

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও বললো—না। পুরী গিয়ে তারপর দেখো, কেমন ?

পুরীর হোটেল।

যমুনাকে নিয়ে একটা ফ্যামিলি স্যুট ভাড়া করেছি আমি। প্রভাতে সূর্য উঠবার আগেই আমরা বের হই সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয়ের মনোহর দৃশ্যটি দেখতে।

দিগন্ত-বিস্তৃত নীল সমুদ্র। সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল জল আর জল। ঢেউ এর পর ঢেউ ছুটে আসছে তীরের দিকে। কী মহান অতুলনীয় সৌন্দর্য! সহস্র সিংহের গর্জন তুলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ দিনরাত ছুটে আসছে মাটির দিকে, তারপর যেন অভিমানে আছাড় খেয়ে পড়ছে মাটির প'রে।

এই বিস্তৃত জলরাশির ভিতর থেকেই কে যেন একটা লাল গোলককে ঠেলে তুলে দিচ্ছে মনে হয়। লাল গোলকটা ক্রমে সোনার গোলকে পরিণত হয়। একটু একটু করে মাথা উঁচু করতে থাকে জলের ভিতর থেকে। তারপর পূর্ণ উদয় হয়ে গেলে সেই সুবর্ণ গোলকের রঙ বদলাতে থাকে। সোনা হয়ে যায় রূপো। চক্‌চকে পালিশ করা রূপোর মস্তবড় থালা যেন। ধীরে ধীরে জ্যোতি বের হ'তে থাকে। তার পরেই পূর্ণ জ্যোতিতে প্রতিভাত হয় উদিত ভাস্কর। কী সুন্দর সে দৃশ্য। আমরা তো যতদিন পুরীতে ছিলাম রোজই সূর্যোদয় দেখতে সমুদ্রের ধারে যেতাম শেষ রাতে।

সমুদ্র-স্নান করে আর সমুদ্রের মাছের সঙ্গে উড়িষ্যার কাঁকর মেশানো সরু চালের ভাত খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই যমুনার দেহ-যমুনায় আবার জোয়ার এলো।

মাসখানেক পুরীতে কাটিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম আমরা। যমুনাকে আর তার আগের বাড়িতে যেতে দিলাম না। ও আমার কাছেই থেকে গেল।

॥ আঠারো ॥

কলকাতায় ফিরে এসেই আবার চুটিয়ে লেগে গেলাম সাহিত্য করতে। সাহিত্যের বাজারে কিছুটা নামও হয়েছে আমার তখন। বইও বেরিয়ে গেছে খান কুড়ি বাইশ। সেই বাইশ কেতাবের কল্যানে আমি আর অজানার দলে পড়ে নেই তখন। প্রকাশক মহল আমাকে জবরদস্ত লিখিয়ে বলে মেনে না নিলেও কারো দুয়ারে হাজির হ'লে কল্কে পেতে অসুবিধে হয় না তখন। মোট কথা, আমি তখন জাতে উঠেছি।

বাংলা দেশে লেখকের বিচার হয় তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেখে, আর কোন কোন ঘর থেকে তার বই বেরিয়েছে তার হিসেব নিয়ে। অবশ্য কোন কোন গোষ্টিতে জায়গা করে নিতে পারলে অনেক আগেই খ্যাতিমান বলে আখ্যাত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি সে সুযোগ করতে পারিনি, অর্থাৎ গোষ্টিভুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি।

প্রকাশকদের ঘরে কল্কে পাবার আগে আমাকে কি যে করতে হয়েছে আর কি যে করতে হয়নি তার বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিখে পাঠক পাঠিকার ধৈর্য পরীক্ষা করবার ইচ্ছে আমার নেই ; তবুও মোটামুটি ভাবে বলে রাখছি ব্যাপারটা।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস থেকে শুরু করে জীবন-চরিত, উপন্যাস,

অনুবাদ সব কিছুই লিখতে হয়েছে আমাকে। প্রয়োজনের তাগিদে মানে-বই, 'মেড-ইজি', সহায়িকা, ছোটদের ছড়ার বই এবং পাঠ্য পুস্তকও লিখতে হয়েছে। টৈকিক প্রয়োজনেই করতে হয়েছে ও সব। একটি ঘটনার কথা বলি। লেখা গছাবার জন্য স্থানে অস্থানে হানা দিতে দিতে একদিন কোন এক নাম করা কেতাব কোম্পানিতে হাজির হয়েছিলাম। দোকানের মালিক আমাকে বলে বসলেন—আপনার হাতে 'টেক্সট্ বুক' লেখা আসে কি ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—নিশ্চয়ই আসে, বাংলা রিডার,—ইংরেজী রিডার, র‍্যাপিড্ রিডার, ইতিহাস, ভুগোল, কি চাই বলুন ? অঙ্ক আর সংস্কৃত বাদে যা বলবেন, তাই লিখে দিতে পারবো।

ভদ্রলোক বললেন যে, সাবমিটের হাঙ্গামায় যেতে চান না তিনি। তাঁর ইচ্ছে একখানা গ্রামার (ইংরেজী) ও একখানা ট্র্যানশ্লেসনের বই করবেন।

আমি বললাম—ঠিক আছে। গ্রামার গ্রামারই সই। কোন ক্লাসের জন্য আর কতদিনের মধ্যে চান বলুন !

ভদ্রলোক মধুর হাসিতে বদন উদ্ভাসিত করে বললেন—বলছেন তো ! কিন্তু ব্যাপার হ'ল কি জানেন ?

সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে, ব্যাপার কি হ'ল তা আমার জানা নেই।

তিনি তখন সেই অজানা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন আমাকে।

তিনি বললেন যে, বাজারে আমার বই থাকলেও 'টেক্সট্ বুক' জগতে আমি নবাগত; সুতরাং আমার পাণ্ডুলিপি নেওয়াটা একটা 'রিস্কি জব'।

অবাক হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে। বললাম—

'টেক্সট্‌বুক'এ তো সত্যিকারের 'অথর'-এর নামই থাকে না। লিখে মরে কে আর নাম হয় কার—পাঠ্য পুস্তক জগতে এই তা রেওয়াজ। নাম ধার করা হয় দক্ষিণার বিনিময়ে; সুতরাং আমি নবাগত হ'লে কি আসে যায়?

ভদ্রলোক তখন আসল কথা পাড়লেন। আসল কথা মানেই টাকার কথা। আমার মতো 'আনট্রায়েড' লেখককে অগ্রিম দেওয়া মানেই···হেঁ···হেঁ···

ঐ হেঁ হেঁ'-র ভিতর থেকে তাঁর আসল হেঁ হেঁ-টি বুঝে নিলাম আমি। বললাম—আজ্ঞে সে বিষয়ে কিছুটা হেঁ হেঁ তো আছেই, তবে আমাকে আর অগ্রিম দিতে হবে না। পাণ্ডুলিপি দেখেই বরং হেঁ হেঁ-টা দিয়ে দেবেন।

ভরষা পেয়ে ভদ্রলোক বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন—না না, অতোটা 'ওয়েট্' করবার দরকার হবে না। আপনি বরং একটা কি দু'টো 'চ্যাপটার' লিখে নিয়ে আসুন, সেইটুকু দেখেই দরদস্তুর ঠিক করা যাবে।

টাকার তখন আমার ভীষণ দরকার। তাই ভাল মন্দ বিচার না করেই রাজী হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথায়। রাজী হওয়ার পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। সেটি হ'ল এই যে, উক্ত ভদ্রলোককে দিয়ে আমার খান কয়েক উপন্যাস প্রকাশ করবার একটা গোপন বাসনা লুকিয়ে ছিল আমার মনে।

যাই হোক, বাড়িতে ফিরেই গ্রামার নিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা তিনেক কলম চালাতেই লেখা হয়ে গেল দু'টো 'চ্যাপটার'।

পরদিনই ভদ্রলোককে 'ফ্রি স্যাম্পল সাবমিট' করলাম।

তিনি তখন প্রথমে 'ম্যাগনিফাইং গ্ল্যাস ও পরে 'মাইক্রোস্কোপ'

দিয়ে আমার লেখার ভিতর থেকে দোষত্রুটির বীজাণু বের করতে বসে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক 'ল্যাবরেটারী টেস্ট' করবার পর আমার দিকে তাকাবার সুযোগ হ'ল তাঁর। 'সেসন জজ'-এর মতো রায় ঘোষণা করলেন তিনি—চলতে পারে!

আমি তখন সেই হেঁ হেঁর কথাটা তুললাম আবার।

ভদ্রলোক বললেন—এসব কাজের জন্য আমরা পঁচিশ টাকা ফর্মা হিসেবে দাম দিয়ে থাকি।

"আমরা দিয়ে থাকি" অর্থাৎ ভদ্রলোক যেন হামেশাই গ্রামার ছাপছেন, তাই ঐ রকম দর নিয়ে থাকেন। বচন শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো।

মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দিয়ে থাকেন মানে? ক'খানা গ্রামার ছেপেছেন মশাই? আমি তো জানি যে, এই প্রথম গ্রামার ছাপতে যাচ্ছেন আপনি!

আমার এই সরাসরি আক্রমণে ভদ্রলোক একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। আমতা আমতা করে বললেন—না, মানে আমি ঠিক তা বলতে চাইনি—অর্থাৎ কিনা—তা আপনি কত হ'লে দিতে পারেন বলুন না?

আমি বললাম—পঞ্চাশ টাকা ফর্মার কমে আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

—প-ঞ্চা-শ টা-কা? ওরে বাপরে! অতো টাকা দিতে পারবো না স্যর! গোটা ত্রিশেকে পারেন তো বলুন!

আমি বললাম—ত্রিশ টাকা নয়, আপনি পঁয়ত্রিশ করে দিন। তার কমে আমি পারবো না।

পঁয়ত্রিশেই রাজী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমাকে বললেন—টাকাটা স্যর সপ্তাহে সপ্তাহে নিয়ে যাবেন। সপ্তাহের প্রথম দিকে ফর্মা দুয়েক করে ম্যাটার দিয়ে যাবেন, আর শনিবারে টাকা নিয়ে যাবেন, কেমন ?

রাজী হয়ে গেলাম তাঁর কথায়।

দিন চারেকের পরিশ্রমে দুই ফর্মা ম্যাটার লিখে মঙ্গলবার সকালে পৌঁছে দিলাম তাঁর হাতে।

এর পর এলো সেই প্রয়োজনীয় শনিবার। বেলা এগারটা বাজতেই হানা দিলাম তাঁর দোকানে।

আমাকে দেখেই তিনি জামাই আদরে বসিয়ে চা আনতে হুকুম দিলেন। চায়ে আপ্যায়িত করে অবশেষে বললেন—আপনার টাকাটা স্যর আজ 'ম্যানেজ' করতে পারিনি।

এই বলে পকেটে হাত দিয়ে মানি ব্যাগ বের করে একখানা পাঁচ টাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—আজ এই পাঁচটা টাকা নিয়ে যান, বাকিটার জন্য 'নেক্সট উইক'-এর যে কোন দিন আসবেন।

আমি বললাম—ও টাকা বরং আপনিই রেখে দিন, আমার দ্বারা গ্রামার লেখা হবে না।

প্রকাশক মশাই বললেন—আরে, রেগে যাচ্ছেন কেন ? আমি কি আর দেব না বলেছি ?

এই বলে আবার মানিব্যাগ বের করে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে বললেন—এই নিন ! এবারে হ'ল তো ?

এই রকম ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে। টাকার বিনিময়ে এই-ভাবে পরের নামে বই লিখেছি অনেক।

শুধু কি এই!

এ ছাড়াও ছিল বিভিন্ন পত্রিকার জন্য বিনা পয়সায় লেখা। নাম জাহির করবার প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই লিখতে হতো বিভিন্ন পত্রিকায়। কারণ, একটা সার কথা আমি জেনে নিয়েছিলাম যে, ছাই পাঁশ যাই হোক শিরোনামার নিচে ছাপার অক্ষরে নামটা যার যত বেশি বের হয়, তার পক্ষে বাজার 'ক্যাপ্‌চার' করা তত সহজ।

তাই নামের জন্য ঘাট অ-ঘাট বিবেচনা না করেই লিখতে হতো।

বাংলায় একটা চলতি প্রবাদ আছে যে, ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয় হয়, কিন্তু লেখার বেলায় এ নিয়ম খাটে না। লেখা জগতে ঠিক এর উল্টো। এখানে ঘষতে ঘষতেই লেখক হতে হয়। আমার এ কথার সত্যতা খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। হাল আমলের বাংলা সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা সবাই জানেন যে, দশ বার বৎসর ঘর্ষণ করবার ফলেই কয়েকজন লেখক এখন রীতিমত বাজার দখল করে বসেছেন। এঁদের কোন বই এখন বের হ'লে সমালোচকরা এখন আর মুরুব্বিআনার সুরে মন্তব্য করেন না—তাঁরা এখন মুক্তকচ্ছ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন মলাটে এঁদের নাম দেখলেই।

আমিও তাই মহাজনদের পদাঙ্ক না হলেও হস্তাঙ্ক অনুকরণ করে চলেছি তখন, অর্থাৎ সমানে ঘষে চলেছি।

এই প্রাণান্তকর ঘর্ষণের ফলও যে কিছু পাচ্ছি না তা নয়। বই আমারও বের হচ্ছে। তবে যা বের হচ্ছে তার সবই 'কপি-রাইট সেল' করে। পঞ্চাশ, এক'শ, দেড়'শ—যা পাই তাতেই 'কপিরাইট' বিক্রি করি তখন।

টাকার জন্য এইভাবে যখন যা তা করে বেড়াচ্ছি, তখন মাঝে মাঝে মনে হ'তো শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত—প্রথম পর্বের সেই ভদ্রলোকটির কথা, যাঁকে শ্রীকান্ত থলে হাতে বাজার করে ফিরতে দেখেছিল রেঙ্গুনে। নারী-রত্ন লাভ করবার ফলেই বেচারার ঐ রকম হাড়ির হাল।

যমুনাকে নিয়ে ঘর বেঁধে আমারও তথৈবচ। যেন তেন প্রকারেন, টাকা আমার চাই। অবশ্য এবার আর আগের মতো সহজ উপায়ে টাকা রোজগারের ইচ্ছা ছিল না।

॥ উনিশ ॥

অনেকদিন লেনেকার—'আই মিন', মধুমতী দেবীর কথা বলা হয়নি। আমার পক্ষে তার কথা বলা খুব সুখকরও নয়। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, তার সম্বন্ধে সব কথা আমি জানতামও না তখন। অবশ্য একেবারেই যে জানতাম না সে কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। কিছু কিছু খবর এসে পোঁছুতো আমার কানে। আর সে খবরগুলো অন্যের কাছে মুখরোচক হ'লেও আমার কাছে ছিল নিতান্তই অরুচিকর।

তবুও বলতে হচ্ছে। কারণ, আমি ছাড়া আর সবাই তার কথা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

লেনেকা তখন বোম্বাইতে।

চিত্র জগতের হাওয়া আর টাকার টানে সে তার দ্বিতীয় স্বামীকে নিয়ে পাড়ি জমায় বোম্বের পথে। তার এই বোম্বে যাবার একটুখানি ইতিহাসও আছে। ইতিহাসটা হচ্ছে এই যে, জনৈক বোম্বাই প্রযোজক 'নিউ ট্যালেণ্ট'-এর খোঁজে সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছিলেন তখন। হঠাৎ একখানা বাংলা ছবি দেখে মধুমতীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন তিনি। মধুমতীর মধ্যে নাকি যথেষ্ট 'সেক্স এ্যাপিল' আছে বলে তাঁর মনে হয়।

এর পরেই ভদ্রলোকের কলকাতা আগমন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে মধুমতীর সঙ্গে পরিচয়—মধুমতীর কণ্ট্রাক্ট সই, এবং...

এবং তারপর থেকেই বাংলার চিত্রাকাশের উজ্জল তারকা শ্রীমতী মধুমতীর বোম্বাই গমন।

কিন্তু বোম্বাই-মধুর আস্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথমেই মধুমতী বুঝতে পারলো যে, স্বামী নামক একটি ল্যাংবোট পেছনে জুড়ে থাকলে অসুবিধা অনেক। তাতে 'চাঞ্চ' পাবার 'চাঞ্চ' খুবই কম।

তাই তিন আইনের দ্বিতীয় স্বামীও একদা বাতিল হয়ে গেলেন।

বেচারা বাতিল স্বামী তখন কিছুদিন বোম্বাই শহরে ষ্টুডিওগুলোর দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি করে অবশেষে মনের দুঃখে কলকাতার টিকিট কাটলেন।

কিন্তু বাতিল স্বামীর বরাত ভাঙলেও বাতিলকারিনী স্ত্রীর বরাত খুললো। মাসে চার পাঁচ খানা করে ছবিতে কাজ জুটতে লাগলো তার। বোম্বের চিত্র জগতের চাবিকাটির সন্ধান মধুমতী জেনে ফেলেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, ওখানে নাম এবং টাকা দু'টো জিনিসই পাওয়া সহজ; তবে লজ্জা মান ভয়—এ তিন থাকতে নয়।

মধুমতীও তাই অচিরেই ঐ তিনটি বালাইকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রীতিমত খেল দেখাতে শুরু করে দিল।

অনেকের ধারণা যে, বাঙালী অভিনেত্রীরা নাকি তাদের দেহ উন্মুক্ত করতে লজ্জা পায়, কিন্তু সে ধারণা যে ঠিক নয়, মধুমতী তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিল।

হাস্যে, লাস্যে, নাচে, গানে মধুমতী হ'ল চিত্রাকাশের জ্বলন্ত উল্কা। চোখে বিদ্যুৎ, কণ্ঠে মধু, আর দেহে অটুট যৌবনের

কামনা-মুখর উচ্ছলতা—এই তিনটি জিনিসকে আশ্রয় করে সে উড়ে চললো সিনেমা আকাশের বুকে।

পত্রিকায় পত্রিকায় তার তিনরঙা ছবি—দোকানে দোকানে ক্যালেণ্ডার, দেয়ালে দেয়ালে তার নানা ভঙ্গিমার বহুবর্ণ পোস্টার। সে এক মার মার কাট কাট কাণ্ড!

তার কণ্ঠের গান রেকর্ড করতে প্লে-ব্যাক শিল্পীর দরকার হয় না। পরিবেশকবৃন্দ ফতোয়া দিচ্ছেন—

"মধুমতী নেহি হনেসে রূপেয়া নেহি ফাঁসায়গা!"

ফলে প্রযোজকের দল, দলবেঁধে হাজির হ'তে লাগলেন মধুমতীর দরজায়। "যেত্না রূপেয়া লাগে, মধুমতীকো লেনেহি হোঙ্গে"—এই হ'ল তাদের 'ভার্সন'!

শোনা গেল যে, সারা ভারত থেকে দৈনিক প্রেমপত্র যা মধুমতীর নামে আসে, তার সংখ্যাই নাকি কয়েক'শ।

এক মাসের প্রেমপত্র দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করে নাকি সাড়ে তেত্রিশ সের হয়েছিল!

তার এই প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার যুগে মাঝে মাঝে দু'একটা অপ্রিয় সংবাদও ছাপা হ'ত দু'একখানা পত্র পত্রিকায়। একবার মাস তিনেক যাবৎ কোন ছবিতে মধুমতীকে দেখতে পাওয়া গেল না। একখানা দুর্মুখ পত্রিকা হঠাৎ এক রোমাঞ্চকর সংবাদ ছেপে বসলো—মধুমতী নাকি শীগগিরই মা হ'তে চলেছেন।

কিছুদিন পরে অবশ্য সেই পত্রিকাতেই আবার ছাপা হ'ল যে, মধুমতী সম্বন্ধে আগে যে সংবাদ তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন, তা ঠিক নয়। আসলে নাকি তাঁর পেটে টিউমার হয়েছিল এবং কোন নামকরা সার্জেন অস্ত্রোপচার করে তাঁকে নিরাময়

করেছেন। আগের ভুল সংবাদের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশও করেন।

ওয়াকিবহাল মহলের খবর অবশ্য অন্য রকম। তাঁরা বললেন যে, ঐ পত্রিকায় পরবর্তী সংবাদটী ছাপাবার ব্যবস্থা করতে মধুমতীকে হাজার কয়েক টাকা পত্রিকাফাণ্ডে ডোনেশন দিতে হয়েছে।

যাই হোক, নিন্দুকের কথায় কান দিতে নেই। এমনও তো হতে পারে যে, শ্রীমতী ঐ টাকাটা পত্রিকার উন্নতিকল্পে দান করেছিলেন!

শোনা গেল, শ্রীমতীর গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশে চিহ্নিত করতে 'কন্টিনেন্ট' থেকে বেড়িয়েও এসেছে সে একবার।

মধুমতীর জনপ্রিয়তা যখন 'টপ'-এ, আমি তখন কাগজ কলম নিয়ে দিন আর যমুনাকে নিয়ে রাত কাটাচ্ছি ধর্মতলায় আমার সেই ফ্লাটে।

॥ কুড়ি ॥

আরও কিছুদিন পরের কথা।

একদা অপরাহ্নে জনৈক ভদ্রলোকের শুভাগমন হ'ল আমার ডেরায়। শুনলাম তিনি নাকি চিত্রজগতের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট, এসেছেন 'আমার একখানা বই চালিয়ে দিতে পারেন' এই সুসংবাদ বহন করে।

কথায় কথায় তিনি জানালেন যে, প্রযোজক তাঁর হাতে 'রেডি', কেবল গল্পের জন্যই নাকি ঘায়েল করতে পারা যাচ্ছে না তাঁকে। যে গল্পই শোনানো হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করছেন তিনি।

আমি বললাম—কিন্তু আমার তো সিনেমার টেকনিক জানা নেই ভাই!

তিনি বললেন—তাতে কিচ্ছু আসবে যাবে না। গল্প পছন্দ হ'লে 'ট্রিটমেণ্ট' আমরাই করে নেব।

আমি বললাম—আমার লেখা একখানা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি আছে, বলেন তো শুনিয়ে দিই।

ভদ্রলোক আগ্রহের সঙ্গে শুনতে চাইলেন সেই কাহিনী।

শোনানো হয়ে গেলে তিনি বললেন—কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

—কি, বলুন?

—স্ক্রিপট্-টা যদি আমার কাছে দিতেন একবার! প্রডিউসারকে একবার শোনাতে চাই কাহিনীটা। আমার মনে হয়, শুনলেই পছন্দ হবে তাঁর।

চিত্রজগতের এই সব ধুরন্ধরদের তখনও আমি চিনতাম না। তাই সরল বিশ্বাসেই পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে দিলাম তাঁর হাতে।

এর দু'দিন পরে ভদ্রলোক আবার এলেন, এবং জানিয়ে গেলেন যে, তিনি এখন চিত্রনাট্য তৈরি করতে ব্যস্ত আছেন। চিত্রনাট্য লেখা শেষ হয়ে গেলেই স্যুটিং আরম্ভ হবে।

আমি বললাম—কিন্তু লেখাপড়াটা ?

—শীগ্‌গিরই হবে। স্যুটিং আরম্ভ হবার আগেই লেখাপড়াটা হয়ে যাবে।

—তাতো হবে, কিন্তু দরদস্তুর তো কিছু হ'ল না।

আমার কথায় ভদ্রলোক প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন—দেখুন মিস্টার মিত্র, আপনাকে একটা কথা বলছি। কথাটা হচ্ছে এই যে, সাহিত্যজগতে আপনার নাম থাকলেও কাহিনীকার হিসেবে আজও আপনি 'প্লেস' পাননি, কেমন কি না ?

বললাম— তা তো বটেই।

তিনি বললেন—তা'হলেই দেখুন! আমাকে যথেষ্ট 'ফাইট' করতে হয়েছে আপনার এই গল্প নিয়ে। আরে মশাই! প্রডিউসার তো নামকরা কাহিনীকারের গল্প ছাড়া নিতেই চাইছিলেন না। কিন্তু আমি যখন কথা দিলাম যে, এ বই 'ফ্লপ্' করলে তার জন্য সমস্ত দায়িত্ব আমার, কেবল তখনই তিনি রাজী হলেন, নইলে···

আমি বললাম—বেশ তো, এবারে আপনার বক্তব্যটা কি খুলেই বলুন না!

তিনি বললেন—সেই কথাই তো বলছি। আমি 'ফাইভ্ হাণ্ড্রেড রুপীজ' দিতে চাই আপনার বইয়ের 'সিনেমা রাইট'-এর জন্য।

আমি বললাম—বলেন কি মশাই! পাঁচ'শ টাকা তো আমি প্রকাশকদের কাছ থেকেই পাই।

—তা হয়তো পান; কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখবেন যে, এই বই-ই আপনার প্রথম বই যা সিনেমা হতে যাচ্ছে। এরপর হয়তো আরও অনেক বই হবে আপনার···

আমি বললাম—বেশ, তাহলে তাই হবে। কিন্তু লেখাপড়াটা ছু'একদিনের মধ্যেই করে নিলে ভাল হয়।

ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও কাজটা সেরে ফেলছি আমি।

এই বলেই সেদিনের মতো বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

এর কিছুদিন পরেই এক মহরতের নিমন্ত্রণ পত্র এসে হাজির হ'ল আমার নামে। মহরৎ হচ্ছে আমার সেই বইয়েরই, কিন্তু লেখকের নামের উল্লেখ কোথাও নেই। মনটা একটু দমে গেল।

যথানির্দিষ্ট দিনে টালিগঞ্জের এক স্টুডিওতে গেলাম মহরৎ অনুষ্ঠানে। উক্ত ভদ্রলোক (তিনিই আবার পরিচালক) আমাকে সঙ্গে করে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্যুটিং দেখাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কাহিনীকার হিসাবে আমার নাম লেখা হয়নি কেন?

ভদ্রলোক বললেন—ওটা স্যর ভুল হয়ে গেছে তাড়াতাড়িতে। ওর জন্য আপনি কিছু ভাববেন না।

আমার কিন্তু ভাল লাগলো না ভদ্রলোকের ভাবগতিক।

আমি তখন সোজা প্রযোজকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —হ্যাঁ মশাই, আমার কাহিনী নিয়ে মহরৎ করছেন, অথচ আমার সঙ্গে লেখাপড়া করলেন না, এটা কি ব্যাপার?

ভদ্রলোক তো আকাশ থেকে পড়লেন আমার কথা শুনে।

বললেন—আপনার কাহিনী! বলেন কি? তবে যে ডিরেক্টার বললেন এটা তাঁরই কাহিনী। দু'হাজার টাকাও তো তিনি নিয়েছেন কাহিনীর দাম বাবদ।

আমি বললাম—বলেন কি মশাই! এ যে সর্বনেশে ব্যাপার দেখছি। কৈ ডাকুন তো ভদ্রলোককে।

ভদ্রলোক কিন্তু এসেই বোমার মত ফেটে পড়লেন। সু-উচ্চ চিৎকারে তিনি ঘোষণা করলেন যে, ও কাহিনী তাঁরই লেখা।

ব্যাপার বেগোছ দেখে আমি চালাকীর আশ্রয় নিলাম। আমি বললাম—কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন না যে, আমার পাণ্ডুলিপির originalটা ম্যাজিস্ট্রেটের সই নিয়ে এটর্নি অফিসে রাখা আছে। বলেন তো কালই চিঠি পাবেন আমার এটর্নির কাছ থেকে।

আমার কথাশুনে প্রডিউসার ভদ্রলোক রাগে আগুন হ'য়ে পরিচালক মশাইকে যাচ্ছেতাই অপমান করতে আরম্ভ করলেন সবার সামনেই।

শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর মত জোচ্চোর লোককে দিয়ে ছবি পরিচালনা করাবেন না তিনি।

মহা গোলমালের ভিতরে পণ্ড হয়ে গেল সেই মহরৎ অনুষ্ঠান!

পত্রিকার প্রতিনিধিরা আমাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার বলুন তো স্যর?

আমি আনুপূর্বিক ঘটনা জানিয়ে দিলাম তাঁদের।

আমার লেখা বইয়ের প্রথম ছবি ঐ ভাবে পণ্ড হলেও ব্যাপারটা কিন্তু শাপে বর হয়ে দেখা দিল আমার পক্ষে। সেদিনের সেই কেলেঙ্কারীর কাহিনী সালঙ্কারে পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় চিত্রজগতের অনেকেই জেনে গেলেন আমার নামটা।

এই ভাবে জানাজানি হওয়ায় সুযোগও আসতে লাগলো দু'চার জায়গা থেকে। মাস খানেকের মধ্যেই আমার দু'খানা বই কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল ভাল দামেই।

এমনি করেই সিনেমা রাজ্যে আমার প্রথম প্রবেশ।

আমার লেখা কাহিনী নিয়ে তোলা প্রথম ছবিখানিও বেশ ভালভাবেই উত্‌রে গেল। সিনেমার পরিভাষায় বলা চলে, 'হিট্' করলো ছবিখানা।

ফলে চাহিদা বেড়ে গেল আমার। দেখতে দেখতে পাঁচ ছয়-খানা বই কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল। আমি তখন 'আউট এ্যাণ্ড আউট' কাহিনীকার বনে' গেলাম। স্টুডিও মহলেও শুরু হ'ল যাতায়াত।

॥ একুশ ॥

সিনেমা জগতে ঢুকে পড়বার পর কিন্তু এ রাজ্য সম্বন্ধে ধারণা পালটে গেল আমার।

এ রাজ্যে সবাই দেখি বিশেষজ্ঞ। এই বিশেষজ্ঞরাই নিয়ন্ত্রণ করেন বাংলার চিত্র জগৎ।

একদিন কথায় কথায় জনৈক উচ্চশিক্ষিত প্রযোজক আমাকে বললেন যে, তিনি গোর্কির 'মা' বইখানার চিত্ররূপ দেবেন ঠিক করেছেন।

আমি বললাম—জারের আমলের রাশিয়ার পটভূমিকায় লেখা ঐ কাহিনীকে কি ঠিকমত রূপ দিতে পারবেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক যা বললেন সে কথা শুনেই তো আমার চক্ষুস্থির।

তিনি বললেন যে, বইখানাকে বাংলাদেশের উপযোগী করে ঢেলে সাজবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছবির পরিচালক নাকি কংগ্রেসের ইতিহাস পড়তে শুরু করে দিয়েছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—গোর্কির 'মা' বইতে কংগ্রেসের ইতিহাস! সেটি আবার কি বস্তু?

ভদ্রলোক বললেন যে, পরিচালক নাকি বলেছেন বইখানাকে তিনি বাংলার কংগ্রেস আন্দোলনের ধারায় ঢেলে সাজবেন। পাত্র-পাত্রীর নামও বদলে বাঙালী নাম দেওয়া হবে।

শুনে একেবারেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

এর পর যতই ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে লাগলাম চিত্রজগতের লোকদের সঙ্গে ততই দেখতে পেলাম যে, এ এক আজব রাজ্য। এখানে কাহিনী তৈরী করতে সাহিত্যিকের দরকার হয় না।

কতকগুলো 'হিট্ পিকচার' থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়েই কাহিনী তৈরি হয়ে যায়। তারপর ঐ সব জগাখিচুরী কাহিনীকে শোনানো হয় হবু প্রযোজকদের। কাহিনী শোনাবার সময় এমনই সব যান্ত্রিক বচনের ধূম্রজাল স্থষ্টি করা হয় যে, বেচারা প্রযোজক কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাতে থাকে।

সিকোয়েন্স, কাট্, ডিজল্ভ্, মিক্স, ফেড্ ইন্, ফেড্ আউট্, ক্যামেরা প্যান, ক্যামেরা ট্রাক, ক্লোজ আপ্, সেক্স অ্যাপিল, কমার্শিয়াল শট্, লং শট্, মিড শট্, ভিস্যুয়েলাইজেসন, ট্রিটমেণ্ট, ইত্যাদি যান্ত্রিক বচনের 'ক্যামোফ্লেজ' দিয়ে আসল ব্যাপারটা ঢেকে রেখে কাহিনী শোনানো হয় প্রযোজকদের।

অবশ্য ঝানু প্রযোজকদের কাছে এরা পাত্তা পায় না। এরা তাই রিক্রুট করে আনে নতুন প্রযোজকদের। মাত্র দশ কি পনের হাজার টাকা নিয়ে ছবি করতে আসে, এরকম প্রযোজকও দেখতে পাওয়া যায় অনেক।

যাই হোক, চিত্র জগতে এসে আমার আর্থিক স্থবিধা যে কিছু হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। একখানা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ীও আমি কিনে ফেলেছিলাম সস্তায়। গাড়ী কিনবার পর 'প্রেসটিজ'ও বেড়ে গিয়েছিল কয়েক ডিগ্রী।

এর পরবর্তী অধ্যায়ই হ'ল পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে আমার আত্মপ্রকাশ।

চিত্রনাট্য লেখাটা আগেই রপ্ত করে নিয়েছিলাম, এইবার পরিচালনাতেও হাত দিলাম। আমার পরিচালিত প্রথম ছবিখানা আসলে খুব সুবিধার না হলেও বন্ধুবান্ধবদের ধরাধরি করে "যুগান্তকারী চিত্র" বলে দেড়গজি সমালোচনা বের করিয়ে ফেললাম বিখ্যাত পত্রিকাগুলোর সিনেমা সম্পাদকদের দিয়ে।

আসলে ওখানেও 'সিক্রেসি'। দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে একদা আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় ভালো সমালোচনা বের করা কঠিন হ'লে না মোটেই। এতে প্রযোজক আর পরিবেশক মারা গেলেও আমি বেঁচে উঠলাম। কিছুদিনের মধ্যেই "সুবিখ্যাত পরিচালক", "খ্যাতনামা সাহিত্যিক-পরিচালক", প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হ'তে লাগলাম আমি সিনেমা-সংক্রান্ত পত্র পত্রিকায়।

হাজারো রকম ভুল আর 'টেকনিক্যাল ডিফেক্ট' নিয়ে আমার এক একখানা যুগান্তকারী চিত্র মুক্তি পেতে লাগলো আর হৈ হৈ পড়ে যেতে লাগলো চিত্র-জগতে।

॥ বাইশ ॥

অনেকদিন পরে আবার মধুমতীর কথা বলতে যাচ্ছি। মধুমতীর তখন শুরু হয়েছে ভাটার টান। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চিত্র-জগতে, বিশেষ করে বোম্বের চিত্র-জগতে তারকার ঔজ্জ্বল্য ততদিনই থাকে যতদিন তার দেহে থাকে যৌবন। স্টুডিও মহলে একটা চালু কথা আছে—"টেম্পো ঝুলে গেছে।" অভিনেত্রীর যৌবনের বেলাতেও এই উপমাটি প্রযোজ্য। টেম্পো ঝুলে গেলে যেমন ছবি মার খায়—যৌবন শেষ হলেও তেমনি অভিনেত্রীর চাহিদা থাকে না। তাই অনেক 'হট্ ফেভারিট'কেও 'কোল্ড' হয়ে যেতে দেখা যায় কয়েক বৎসর পরেই। এরা যেন আলেয়ার আলো। যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি দপ্ করেই নিবে যায় আবার।

তারকারাও যে তাদের এই আলেয়া-জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের বিষয় না জানে তা নয়। এরা তাই চেষ্টা করে চাহিদা থাকতে থাকতে আখের গুছিয়ে নিতে। আখের মানে বাড়ি, গাড়ি আর 'ব্যাঙ্ক ব্যালান্স'।

এদের মধ্যে যারা একটু বেশি চালাক, তারা আবার নিজেরাই প্রযোজিকা হয়ে ছবি তৈরি করতে আরম্ভ করে। এতে কারো কারো লাভ হয় আবার কেউ কেউ ডুবেও যায়।

একখানা বোম্বাই ছবির মুক্তি পর্যন্ত ব্যয় হয় কম পক্ষে তিন লাখ টাকা। সুতরাং সে ছবি যদি মার খায় তাতে ডুবে যাবারই কথা। অবশ্য ডুববার সময় এরা শুধু নিজেরাই ডোবে না, পরিবেশকদেরও সঙ্গে সঙ্গে ডোবায়, কারণ ছবি তোলবার বেশির ভাগ টাকাই পরিবেশকরা দেয়।

যাই হোক চিত্র-জগতের এ সব 'স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌'-এর কথা বাদ দিয়ে এবার আসল কথা, মানে মধুমতীর কথায় আসা যাক। শ্রীমতি মধুমতী যখন দেখলো এবং বুঝলো যে, অচিরেই সে বাতিল তারকার দলে চলে যাবে, তখন সময় থাকতেই পূর্বগামিনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অর্থাৎ 'মধুমতী প্রডাকসন্স' নামে এক চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ছবি তোলার কাজে হাত দিলো।

নিজের কোম্পানির ছবির নায়িকাও হ'ল সে নিজেই। সস্তায় কিস্তি মাৎ করতে গিয়ে এক চতুর্থ শ্রেণীর কাহিনীকে পঞ্চম শ্রেণীর পরিচালকের সাহায্যে রূপদান করলে সে।

আগেই বলেছি, মধুমতীর তখন বাজার মন্দা।

ভারতের নানা জায়গা থেকে কযেকজন সুরূপা ও নৃত্যপটিয়সী তারকা এসে আগের দিনের তারকাদের নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন তখন।

সেই ডামাডোলের বাজারে বিগত যৌবনা মধুমতী নায়িকার ভূমিকায় রূপদান করতে গিয়ে একেবারেই মাঠে মারা গেল। ছবিখানি মোটেই চললো না। পত্রিকাওয়ালাদের নির্দয় লেখনি সে ছবিকে শুধু বাজে ছবি বলেই ক্ষান্ত হ'ল না, মধুমতীকেও উপদেশ দিল চিত্রজগত থেকে বিদায় নিতে।

বেচারী মধুমতী তখন হালে পানি না পেয়ে পরিবেশক বধ করবার

ঝিকিরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোন পরিবেশকই বধ হ'তে রাজী হ'ল না। ফলে বোম্বে শহরের মায়া কাটিয়ে ঘরের মেয়ে আবার ঘরেই ফিরে এলো। বাংলার মেয়ে মধুমতী আবার ফিরে এলো বাংলায়।

বাংলায় ফিরে এসে অবশ্য ভালই হ'ল তার।

সঙ্গে সঙ্গে সাত আটখানা ছবিতে কাজ পেয়ে গেল সে। বলা বাহুল্য, নায়িকার ভূমিকাই লাভ করলো সে ঐ সব ছবিতে।

প্রথম ছবিখানা উত্‌রেও গেল ভাল ভাবেই। গল্পাংশের কল্যাণে আর বিজ্ঞাপনে বোম্বাই প্যাঁচের দৌলতে ছবিখানি হিট্ করলো।

আমার সঙ্গেও কয়েকবার দেখা হয়ে গেল তার সেই সময়। প্রথম যেদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে দিনটির কথা আজও মনে আছে।

দুপুরে টিফিনের ছুটিতে স্যুটিং বন্ধ রেখে ফ্লোর থেকে বেরুতেই ওর সঙ্গে সামনাসামনি হয়ে গেলাম। আমি যে ষ্টুডিওতে স্যুটিং করছিলাম সেই ষ্টুডিওরই আর এক ফ্লোরে চলছিল মধুমতীর কাজ। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছিল ও।

ভূতপূর্ব স্ত্রীর সঙ্গে এই ভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি একটু বিব্রতই হয়েছিলাম সেদিন। একবার মনে হয়েছিল, কথা না বলেই কেটে পড়ি। কিন্তু কেন যেন তা পারলাম না।

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"কেমন আছ?"

ও বললে—ভাল।

ব্যস্! এই পর্যন্তই। তারপরেই দু'জনে দু'দিকে।

পরে আরও দু'চার দিন দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। সৌজন্য সূচক কথাবার্তাও হয়েছে কিছু কিছু।

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ এমন একটা ঘটনার সৃষ্টি হয় যার ফলে আমার অবস্থা একেবারে 'স-সে-মি-রা' হয়ে ওঠে।

জনৈক পয়সাওয়ালা প্রযোজক আমাকে দিয়ে ছবি তোলাবেন বলে কণ্ট্রাক্ট করেন। কণ্ট্রাক্ট সই হয়ে যাবার পর আসে অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচনের পালা। প্রযোজক মশাই আমাকে বলেন যে, ছবির নায়িকার ভূমিকায় মধুমতীকে নিতে চান তিনি।

এই কথা শুনেই তো আমার চক্ষুস্থির। বলেন কি ভদ্রলোক!

আপত্তি করবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকায় বাধ্য হয়েই আমাকে সম্মত হতে হয়। প্রযোজক মশাই বলেন যে, দেড় মাসের মধ্যেই ছবি শেষ করতে চান তিনি। দরকার হলে দিন রাত স্যুটিং চালাতে হবে।

মোটা টাকার কণ্ট্রাক্ট। ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর আমার নেই। তাছাড়া ছাড়বোই বা কি বলে?

তাই বাধ্য হয়ে নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রী-দের ডেকে কাহিনী শুনিয়ে দিলাম একদিন।

নায়ক নায়িকা দু'জনেই নামকরা শিল্পী, সুতরাং চরিত্র ব্যাখ্যা করবার দরকার হ'ল না।

এর পরেই আরম্ভ হয়ে গেল স্যুটিং। সপ্তাহে পাঁচ দিন করে স্যুটিং চললো। প্রত্যেক 'স্যুটিং ডে'তেই দেখা হ'তে লাগলো মধুমতীর সঙ্গে।

একদিন স্যুটিংয়ের অবসরে ও আমাকে বললো—তুমি তো বেশ ভাল ডিরেক্শন দাও!

আমি বললাম—ধন্যবাদ! চিত্রাকাশের উজ্জ্বলতম তারকার এই 'কমপ্লিমেণ্ট' এর কথাটা আমার মনে থাকবে।

—শুধু 'কমপ্লিমেন্ট'-এর কথাটাই মনে থাকবে! আর কিছু নয়?

—নয় কেন, তার অভিনয়ের কথাও মনে থাকবে আমার।

—'থার্ড পার্স্‌ন'টা কি ছাড়া যায় না?

এই সময় 'সাইড্‌ হিরোইন' সুমিতা দেবী এসে পড়ায় আমার আর বলা হ'ল না কিছু।

সুমিতা দেবী এসেই বললেন—

"কতদিন যে বসে আছি,
পথ চেয়ে আর কাল গুণে,
দেখা পেলাম ফাল্গুনে"···

মধুমতী বললো—পথ চাওয়া, কাল গোণা—ও সব 'স্টেজ' আমি পার হয়ে গেছি ভাই। ওগুলো উদীয়মানাদের বেলাতেই ভাল খাটে।

মধুমতীর কথা শুনে সুমিতার রঙ করা মুখ লাল হ'ল কি না টের পাওয়া না গেলেও তার চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে নেমে গেল।

মনে হ'ল লজ্জা পেয়েছে সে।

লজ্জা পাবার কারণও একটা ছিল। সুমিতা দেবীর সঙ্গে বাংলার কোন সুদর্শক নায়কের প্রেমঘটিত ব্যাপার পত্রিকাতেও বেরিয়ে গিয়েছিল।

গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি তখন কেটে পড়লাম ওদের কাছ থেকে।

মধুমতী যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই নির্দেশ মতো প্রেমের অভিনয় করতো ছবির নায়কের সঙ্গে, তখন আমার মনের মধ্যে কে যেন তীরের খোঁচা মারতো।

মনের ভিতরে কে যেন বার বার বলতো—ওরে, দুর্ভাগা সাহিত্যিক, আজ যাকে তোর ছবির নায়িকারূপে দেখে মন খারাপ করছিস, এ একদিন তোরই ছিল! নিজের দোষেই তুই তাকে হারিয়েছিস!

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতো আমার বুকের ভিতর থেকে।

॥ তেইশ ॥

মানুষ যা চায় তা হয়তো পায় না, কিন্তু যা পায় তারও কিছু দাম আছে। সে দামের কথা তারা আগে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে পাওয়া জিনিস হারাবার পরে। তাই যমুনার দামও আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। বোধ হয় অতি সহজে তাকে পেয়েছিলাম বলেই বুঝতে পারিনি তার দাম। যমুনাকে আমি পেয়েছিলাম অনেক আগে থেকেই, কিন্তু সে পাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটু অতৃপ্তি—একটুখানি গোঁজামিল ছিল। কিন্তু শেষবার তাকে পাবার পর সেই গোঁজামিলের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাকে পেয়ে আমার মনে হয়েছিল, এ পাওয়া একান্তই স্বাভাবিক।

প্রথম যৌবনের মাদকতা—ভালবাসবার আর ভালবাসা পাবার জন্য আকুলতা—এ সব আর ছিল না আমার মধ্যে। আমার তখন বয়েস হয়েছে। যমুনার দেহেও আর যৌবন নেই। তবুও তাকে ভাল লাগতো আমার। তবে ভাল লাগতো বলেই সে যে আমার জীবনে অপরিহার্য ছিল, তা মনে হতো না কোনদিনই।

ওর কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব। আমি তাই শিক্ষক রেখে ওকে গান শিখিয়েছিলাম। চমৎকার গাইতো ও। সব চেয়ে ভাল লাগতো ওর কণ্ঠের কীর্তন গান। একদিন আমি বলেছিলাম—তোমাকে রেডিওতে নিয়ে যাই চলো।

উত্তরে ও বলেছিল—না, রেডিওতে বা কোন জলসায় আমি গান গাইব না। আমার এ গান শুধু তোমার জন্যই, তুমিই শুধু শুনবে আমার গান।

এরপর আর কোনদিন আমি ওকে কোথাও গান গাইবার কথা বলিনি।

চিত্র পরিচালক হয়ে বহু মেয়ের সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হতো। তাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী। যমুনার চেয়েও সুন্দরী। নবাগতাও ছিল অনেক। তারা 'চান্স'-এর জন্য আসতো। কিন্তু তাদের 'চান্স' দিয়ে নিজে 'চান্স' নেবার কথা কোন দিনই মনে আসতো না আমার।

এর মূলেও বোধ হয় যমুনা। কোন মেয়ের দিকে একটু বেশি সময় তাকালেও মনে হতো যমুনার কথা। মনে হতো আমি যেন অবিচার করছি তার ওপর।'

আশ্চর্য! কেন যে আমার মনে এ দুর্বলতা আসতো, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। যমুনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি! ও পরস্ত্রী—ও দেহজীবিনী—যে কেউ ইচ্ছা করলে ওকে পেতে পারতো। পেয়েও ছিল অনেকে। তবুও কেন যেন মনে হতো ও একমাত্র আমারই।

সময় সময় লেনেকার কথা মনে হতো। চকিতে মনের মধ্যে ভেসে উঠতো তার ছবি। কিন্তু সে ছবির দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখতাম যমুনা এসে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। লেনেকা অতীত। যমুনা বর্তমান। বর্তমান এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে অতীতকে।

এই সময় হঠাৎ একদিন কার মুখে যেন খবর পেলাম, যতীন মারা গেছে। খবরটা যমুনাকে বলতেই ও মৃদু হেসে বললো—যাক্, বাঁচা গেল!

সেদিন ওর মুখের সেই কথা তিনটি শুনে আমার মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল ওর ওপর। হাজার হলেও, যতীন ওর স্বামী ছিল একদিন। স্বামী বলে মেনে নিয়ে যার সঙ্গে এক সময় ঘর করেছে, তার মৃত্যু-সংবাদ ও এতটা হৃদয়হীন ঔদাসীন্যের সঙ্গে কি করে নিলো!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনা বললো—কি গো! মুখখানা আঁধার হয়ে গেল যে?

আমি বললাম—আঁধার হওয়া কি অন্যায়! সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি তোমার মনোভাব দেখে। আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনলেও হয়তো এই ভাবেই 'বাঁচা গেল' বলবে তুমি!

আমার কথা শুনে ওর মুখখানা কালী হয়ে গিয়েছিল সেদিন। একটু চুপ করে থেকে ও বলেছিল—আমাকে আঘাত দিয়ে কি তুমি আনন্দ পাও নাকি? ওর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে মনে বাধলো না তোমার? ও আমার কে?

—কে মানে! ও তোমাকে আইনসঙ্গতভাবে বিয়ে করেছিল, সে কথা কি ভুলে গেলে?

—না, ভুলিনি, কিন্তু আইনই কি সব? কী অবস্থায় পড়ে ওকে বিয়ে করেছিলাম তা তুমি কি বুঝবে। অভাবের চাপে পড়ে এ দেহকেও তো পরের কাছে দান করতে বাধ্য হয়েছি অনেক-বার—তুমি তাহলে বলতে চাও সেই সবই সত্যি, আর আমার মনটা মিথ্যে? তোমার কাছেই তো শুনেছি, কোন দেশে নাকি

মেয়েদের হাটে বাজারে বিক্রি করা হতো গরু ছাগলের মতো—বাধ্য হয়ে সেই সব হতভাগিনীরা সমস্ত অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করতো। তুমি কি তাহলে বলতে চাও যে, যারা ঐ সব মেয়েদের কিনে নিয়ে ভোগ করতো তারাই তাদের স্বামী? কিছুতেই না!

—তা না হয় না হ'ল, কিন্তু আমিই বা তোমার কে? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাকে তো সমাজের আইনে ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছু বলবে না!

—সমাজের আইনে কি বলবে জানি না, কিন্তু আমার মনের আইনের কাছে আমি নির্দোষ।

যমুনার মুখে তার সেই নতুন আইনের কথা শুনে আমি বললাম—তোমার আর আমার কথা নিয়ে একখানা বই লিখলে কেমন হয়?

ও বললো—হ্যাঁ, তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।

এর কিছুদিন পরের কথা। সে দিন স্টুডিও থেকে ফিরে যমুনাকে বললাম—চলো দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসি। গরমের সময়টা বেশ লাগবে ওখানে।

—তা গেলে মন্দ হ'তো না, এবারের গরমটা খুবই জোর পড়েছে এখানে।

আমি বললাম—বেশ সেই কথাই থাকলো, হাতের ছবিখানা শেষ হলেই একেবারে শৈলশিখরবাস!

—ক'দিন লাগবে ছবিখানা শেষ হ'তে?

—বেশি দিন নয়। আর তিনটে দিন স্যুটিং হলেই হয়ে যাবে। ভাল কথা, এ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় কে অভিনয় করছে জানো?

—কে ?

—শ্রীমতী মধুমতী দেবী !

—মধুমতী দেবী ! মানে, তোমার বউ ?

—হ্যাঁ, আমার ভূতপূর্ব বউ।

—তোমার সঙ্গে তাঁর কথা হয় ?

—তা হয় বৈ কি !

—তাঁকে এখানে নিয়ে এসো না একদিন !

যমুনার নিজের কথাতেই উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।

॥ চব্বিশ ॥

আমার সঙ্গে বোধ হয় বিধাতা নামক ভদ্র লোকটির কিঞ্চিৎ আড়ি ছিল। তা না হ'লে প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি বাধা সৃষ্টি করে চলবেন কেন? দার্জিলিং যাবার ব্যাপারেও তিনি আমাকে বাধা দিলেন।

সেদিন ছবির 'ফাইনাল টেক্' শেষ করে বাড়িতে এসেই দেখি যমুনা বিছানায় শুয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ও বললো—জ্বর।

সেই জ্বরই দেখা দিল বসন্ত রূপে।

বসন্তের গুঁটিতে ভরতি হয়ে গেল যমুনার সারা দেহ।

চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। ডাক্তার, কবিরাজ, ঝাড়-ফুঁকওয়ালা সবাইকে দিয়েই বাঁচাতে চেষ্টা করলাম ওকে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বার দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে যমুনা মারা গেল।

যাবার সময় বলে গেল—চললাম ঠাকুর পো! জীবন-ভোর দুঃখ দিয়েছি তোমাকে, আজ তাই ছুটি নিচ্ছি তোমার কাছে।

আমার চোখের কোণে দু'ফোটা জল এসে পড়লো।

বিকেল ছুটো সতের মিনিটের সময় যমুনা শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলো।

আমি সেদিন কেঁদেছিলাম।

শিশুর মতোই চীৎকার করে কেঁদেছিলাম।

কিন্তু কাঁদলে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না ওকে, তাই শোকে মুহ্যমাণ হয়ে পড়লেও ওর সৎকারের ব্যবস্থা করতে হ'ল আমাকেই।

খবর পেয়ে চিত্র জগতের অনেকেই এলেন আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে।

রাত ন'টার মধ্যেই যমুনা ছাই হয়ে গেল।

ওর শেষ অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে শূন্য মনে বাড়িতে ফিরলাম রাত দশটার সময়।

বাড়ীতে ফিরে এসেই বুকের ভিতরটা গুমরে উঠলো আমার।

যমুনা নেই সে কথা যেন ভাবতেও পারি না আমি।

সামাজিক আইনে ও আমার স্ত্রী ছিল না সত্যিই, কিন্তু ও ছিল আমার স্ত্রীর চাইতে বেশি। যমুনার জন্য আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছিলাম। লেনেকাকেও আমি হারিয়েছিলাম ওরই জন্য।

ঘরের যেদিকেই তাকাই সর্বত্রই যমুনার চিহ্ন। দেয়ালে যমুনার ফটো। আলনায় তার শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া। প্রতিটি জায়গায়, ঘরের প্রতিটি কোণে যমুনার হাতের হাজারো নিদর্শন। রান্নাঘরে ওর হাতে তৈরি উনুন। ওর সেলাইকরা টেবিল ক্লথ আমার টেবিলে। ও আমার জীবনে যে কতখানি জায়গা দখল করে ছিল সে কথা বুঝতে পারলাম ওর মৃত্যুর পরে।···

আপনারা হয়তো বলবেন যমুনা পাপী। যমুনা অসতী। যমুনা দেহ বিলাসিনী। কিন্তু আমার কাছে ও স্বর্গের দেবীর চাইতেও

উঁচু। একমাত্র আমিই জানি যমুনাকে। কেন ও যতীনকে বিয়ে করেছিল, কেন ও স্বামী বেঁচে থাকতে হিদারাম সরকার লেনে আমার কাছে আত্মদান করতে চেয়েছিল, কেন ও মাসেজ ক্লিনিকে চাকরি নিয়েছিল, কেন রামবাগানে ঘর ভাড়া নিয়েছিল সে কথা হয়তো আপনারা বুঝবেন না। অন্ধ সংস্কার আপনাদের মুখ দিয়ে বলাবে—যমুনা কলঙ্কিনী!

হঠাৎ মনে হ'ল ওর মাকে খবর দেবার কথা। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন সে খবর রাখতাম না আমি। যমুনাও কোনদিন বলেনি তাঁর কথা।

ওর আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে তাও জানতাম না। বহুদিন আগে যতীনের মুখে শুনেছিলাম যে, ও নাকি খুব বড় ঘরের মেয়ে। ওর দুই জ্যাঠা আর এক কাকা বেঁচে আছেন। কলকাতা শহরে নাকি বাড়িও আছে তাঁদের একখানা। কিন্তু ওর বাবা মারা যাবার পর ওর মাকে তাঁরা বাড়িতে থাকতে দেননি। নানাভাবে অত্যাচার করে বিধবাকে বাড়িছাড়া করেছিলেন তাঁরা। তারপর মেয়েটির হাত ধরে ওর মা আশ্রয় নেন ভাইয়ের বাড়িতে। যমুনার প্রথম বিয়েও নাকি মামা বাড়ি থেকেই হয়। তারপর যমুনা যখন বিধবা হয়ে মায়ের কাছে ফিরে এলো তখন নাকি ওর মামা ওদের ভরণ পোষণ করতে পারবেন না বলে বিদায় দেন। বিপদে পড়েই যমুনার মা হরেন পণ্ডিতের বিধবা-বিবাহ সমিতিতে যান। পণ্ডিতকে তিনি বলেন যমুনার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে। যতীনের সঙ্গেও পরিচয় হয় ওখানেই। এর কিছুদিন পরেই যমুনাকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যায় যতীন।

কিন্তু কে যে যমুনার মামা, বা কে তার জ্যাঠা বা কাকা তাদেরও নাম ঠিকানা যতীন বলেনি। যমুনার কাছেও জানতে চাইনি আমি তার বংশ-পরিচয়। তাই ওর মৃত্যুর খবর ওর মা বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনকে জানানো সম্ভব হ'ল না।

তবে ওর আত্মীয় স্বজন খবর না জানলেও যমুনার মৃত্যুর সংবাদ অনেকেই জেনেছিল কারণ কলকাতায় প্রায় সব ক'খানা পত্রিকাতেই বিখ্যাত-পরিচালকের জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যু সংবাদটা ছাপা হয়েছিল।

॥ পঁচিশ ॥

কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে এসে গেছি এবারে। ইচ্ছে হ'লে নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যও বলতে পারেন। অধিকাংশ নাটকেরই যেমন শেষ দৃশ্য মিলনান্ত হয়, দৈবচক্রে আমার জীবননাট্যেও তাই হয়েছিল।

যমুনার মৃত্যুর কয়েকদিন পরের কথা।

শোকের প্রথম বেগটা প্রশমিত হয়ে এসেছে। আমি আবার লেখায় হাত দিয়েছি তখন।

সেদিনও রোজকার মত খাতা কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলাম। হঠাৎ লেনেকার প্রবেশ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—তুমি হঠাৎ!

—কেন, আসতে নেই নাকি?

—না, তা বলছি না, তবে আশ্চর্য হয়েছি।

—তোমার যমুনা মারা গেছে কাগজে দেখলাম।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ও আবার বললো—খুবই দুঃখ পেয়েছো?

তখনও চুপ করে রইলাম।

—যমুনাকে তুমি খুবই ভাল বাসতে!

আমি ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে একখানা পাণ্ডুলিপি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—পড়ো।

ও বললো—সে কি! কি আছে এতে?

আমি বললাম—এতেই লেখা আছে সব কথা। যমুনার কথা, আমার কথা, তোমার কথা—সব।

—কী সর্বনাশ! নাম লিখেছো নাকি?

—কেন, কি দোষ তাতে। আমার জীবনের যত কিছু পাপ, যত অন্যায় সবই অকপটে লিখেছি এই কাহিনীতে। পড়োই না।

লেনেকা পড়তে আরম্ভ করলো।

অখণ্ড আগ্রহে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে চললো ও। আমি তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

পড়া যখন শেষ হ'ল তখন দেখি ওর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ছে।

বললাম—কি? জানতে পারলে যমুনাকে?

ও বললো—এ সব কথা আগে বলোনি কেন?

—কি হতো তাহলে?

—তাহলে আমরা এক সঙ্গে থাকতাম দু'টি বোনের মতো। আমি শুধু নিজের দিকটাই দেখেছি চিরকাল। যমুনা কে, কেন তুমি যমুনাকে অতো ভালবাসতে আমি তা কোনদিনই বুঝতে পারতাম না যদি তোমার এই লেখা আমি না পড়তাম।

—এবারে তাহলে বুঝতে পেরেছো তো, কেন আমি যমুনাকে অতো ভাল বাসতাম। তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। তোমার মত স্ত্রী অনেকেই পায় না কিন্তু তোমাকেও আমি স্ত্রীর সম্মান দিই নি। দিতে পারি নি ঐ যমুনার জন্যই। আজ সে চলে গেছে, তুমিও আর নেই আমার—তাই তার কথা তোমার কাছে অতো সহজে বলতে পারছি।

—কিন্তু এ তুমি করেছো কি? নিজের জীবনের সব কথা কি ওভাবে কেউ লেখে? তোমার জেল খাটার কথাও যে গোপন করোনি এতে?

—কি হয়েছে তাতে? ভুয়ো সম্মান থেকে বঞ্চিত হবো, এই তো? নিজের স্ত্রী যাকে ছেড়ে গেছে, যাকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বেসেছিলাম তাকেও যখন ভগবান কেড়ে নিলেন, তখন খানিকটে সম্মানের বালাই পেলেই বা কি আর না পেলেই বা কি? তাছাড়া যারা আমাকে জানে তারাই শুধু আমাকে ঘৃণা করবে কিন্তু সাহিত্যের দরবারে আমার এই কাহিনী চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এ তুমি দেখে নিও। আমি বেঁচে থাকতে হয়তো আমার এই কাহিনীর জন্য আমি পাবো ঘৃণা আর অসম্মান, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর দেশের মানুষরা একদিন স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এইভাবে নিজের জীবনের কলঙ্কময় কাহিনীগুলোকে অকপটে কোন লেখকই প্রকাশ করেন নি। আজ আমি একা, সম্পূর্ণ একা। তাই ভাবছি বাকী জীবনটা সাহিত্য সেবাতেই কাটিয়ে দেব এই ঘরে বসে।

লেনেকা বললো—না তুমি একা নও। যমুনা চলে গেছে কিন্তু আমি আছি। আমি আজ তোমার কাছে ফিরে এসেছি। এসেছিলাম তোমাকে কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে যাব বলে কিন্তু যমুনাই আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ে গেল তোমার কাছে।

আমি বললাম—সে কি! ভারতবিখ্যাত চিত্রতারকা মধুমতী দেবীকে এই গরীব লেখক কি উপযুক্ত সম্মান আর মর্যাদা দিতে পারবে?

—তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাইছো?

—ভুল বুঝো না লেনেকা···মধুমতী। তোমার সঙ্গে আমার

যে একদিন কোন সম্পর্ক ছিল সে কথা আমি ভুলেই গেছি। তাছাড়া তুমি এখন বড়লোক, সৌভাগ্যবতী। বোম্বের মতো শহরে একখানা বাড়ির মালিক। তোমার একটুকরো হাসির দাম আজ কয়েক হাজার টাকা, যা আমি তিন মাসেও রোজগার করতে পারি না। সুতরাং তোমাকে অপমান করবার মতো সাহস আমার কোত্থেকে আসবে!

—বলে যাও। তোমার বাড়িতে যখন এসেছি, যা খুশি বলে যাও। আমার হাসির দাম অনেক···অনেক কোটিপতি আমাকে এক রাত্রির জন্য লাভ করতে যে কোন অঙ্কের টাকা দিতে প্রস্তুত···আমি চরিত্রহীনা···নটী···আমি ভদ্রসমাজের অনুপযুক্তা···

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় হাঁফিয়ে ওঠে লেনেকা। তার নাকের ডগা কুঁচ্‌কে যেতে থাকে বারবার। স্বাভাবিক ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

তার সেই উত্তেজিত অবস্থা দেখে আমি বললাম—তুমি অকারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠছো মধুমতী। আমি তোমাকে আঘাত দেবার জন্য ও কথা বলিনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, তোমার আমার মধ্যে আজ আসমান জমিন ব্যবধান। সাময়িক উত্তেজনার বসে যে কথা তুমি বলে ফেলেছো, আমি তাতে সায় দিলে ভবিষ্যতে ঠক্‌তে হবে তোমাকে। আমি লোকটা যে চরিত্রবান নই তা তো তুমি জানো!

—তা জানি বৈ কি! কিন্তু আমিও তো পুষ্পপাত্রের ধোওয়া ফুলটি নই। জীবনের পথে চলতে গিয়ে ভুল অনেকেই করে, আমিও করেছি। কিন্তু সে ভুলের কি মার্জনা নেই?

—তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো?

—কি হয়েছে তা তুমি কি বুঝবে! কল্পনার অবাস্তব চরিত্র এঁকে তাদের ওপর তোমার মনগড়া 'সাইকোলজি' চাপিয়ে দিয়ে তুমি ভাব, সবার মনের কথাই তুমি জেনে বসে আছ!

—তার মানে! তুমি কি বলতে চাচ্ছো মধুমতী?

—কেন, লেনেকা বলে ডাকতে কি তোমার সম্মানে বাধে?

—না, তা বাধে না। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে ঐ নামে ডাকতেই আমার ভাল লাগে, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—কিন্তু তুমি যদি কিছু মনে করো, তাই দু'বার ও নামটা মুখে এসে পড়লেও সামলে নিয়েছি। তোমার আজ স্যুটিং নেই কোনো?

—আমি চলে গেলে কি তুমি খুশি হও?

—আবার উল্টো বুঝলে তো?

—উল্টো আমি মোটেই বুঝি নি। হঠাৎ স্যুটিং-এর কথা এর মধ্যে এনে ফেলা হ'ল কেন তা কি আমি বুঝি না মনে কর নাকি?

লেনেকার এই কথায় হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে আমার পক্ষে। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি আজ আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে চাও নাকি?

আমার কথায় দমে গিয়ে লেনেকা বললো—না, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার পেশা নয়।

—নিশ্চয়ই নয়। তোমার পেশা লোকের মনোরঞ্জন করা। তুমি অভিনেত্রী—শিল্পী। আমাদের মতো লেখকদের সৃষ্ট অবাস্তব চরিত্রগুলোকে বাস্তবের ছোঁয়া দিয়ে অপরূপ করে ফুটিয়ে

তোলাই তোমার কাজ। শিল্পী হিসাবে সে কাজে তুমি সাফল্যও অর্জন করেছ। তুমি সর্বজনপ্রিয়া—মর্ত্যের উর্বসী···

—থামো, আর কবিত্ব করতে হবে না। এবার গোটা কয়েক সোজা কথার সোজা উত্তর চাইছি তোমার কাছে।

—কি ?

—আমি যদি এখানে থাকতে চাই তুমি তা দেবে কি না ?

—নিশ্চয়ই দেব। আর কি জানতে চাও ?

—আর কিছু না। আর কিছু জানতে চাইনে আমি। তুমি আমার স্বামী। হ্যাঁ, তুমিই আমার স্বামী। আমি তোমার কাছে অপরাধী। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো !

লেনেকার উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম না আমি। একবার বলতে ইচ্ছা হ'ল—"আমার সে স্বামীত্ব আর নেই।" কিন্তু সে কথাটা চেপে গিয়ে বললাম—অপরাধী তুমি নও লেনেকা, অপরাধী আমি। কিন্তু এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকো তাহলে লোকে কি বলবে ?

লেনেকা বললো—এখনো লোকলজ্জার ভয় তুমি কাটিয়ে উঠতে পারোনি ?

—আমার কথা বলছি না। আমি বলছিলাম তোমার কথা।

আমার এই কথায় হেসে উঠে লেনেকা বললো—এতক্ষণে তুমি আমাকে হাসালে। চিত্রতারকা মধুমতী তার মন থেকে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিনটি জিনিসকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে।

আমি বললাম—মধুমতীর কথা জানিনে, তবে লেনেকাকে দেখে মনে হচ্ছে তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো এখনও আগের মতোই সজাগ আছে।

—তাই না কি·?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকে আর যেতে হচ্ছে না এখান থেকে?

আমি হেসে বললাম—লক্ষণ দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। আমি লোকটা দেখছি নেহাৎই ভাগ্যবান। যমুনা যাবার সময় 'সাবষ্টিটিউট্' দিয়ে গেল আমার জন্য।

লেনেকা বললো—হ্যাঁ, 'সাবষ্টিটিউট্ই' বটে।

তাকিয়ে দেখি, ওর মুখে ফুটে উঠেছে একটা ম্লান হাসির রেখা।